হিন্দোল সর্দারের কেল্লা

ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়

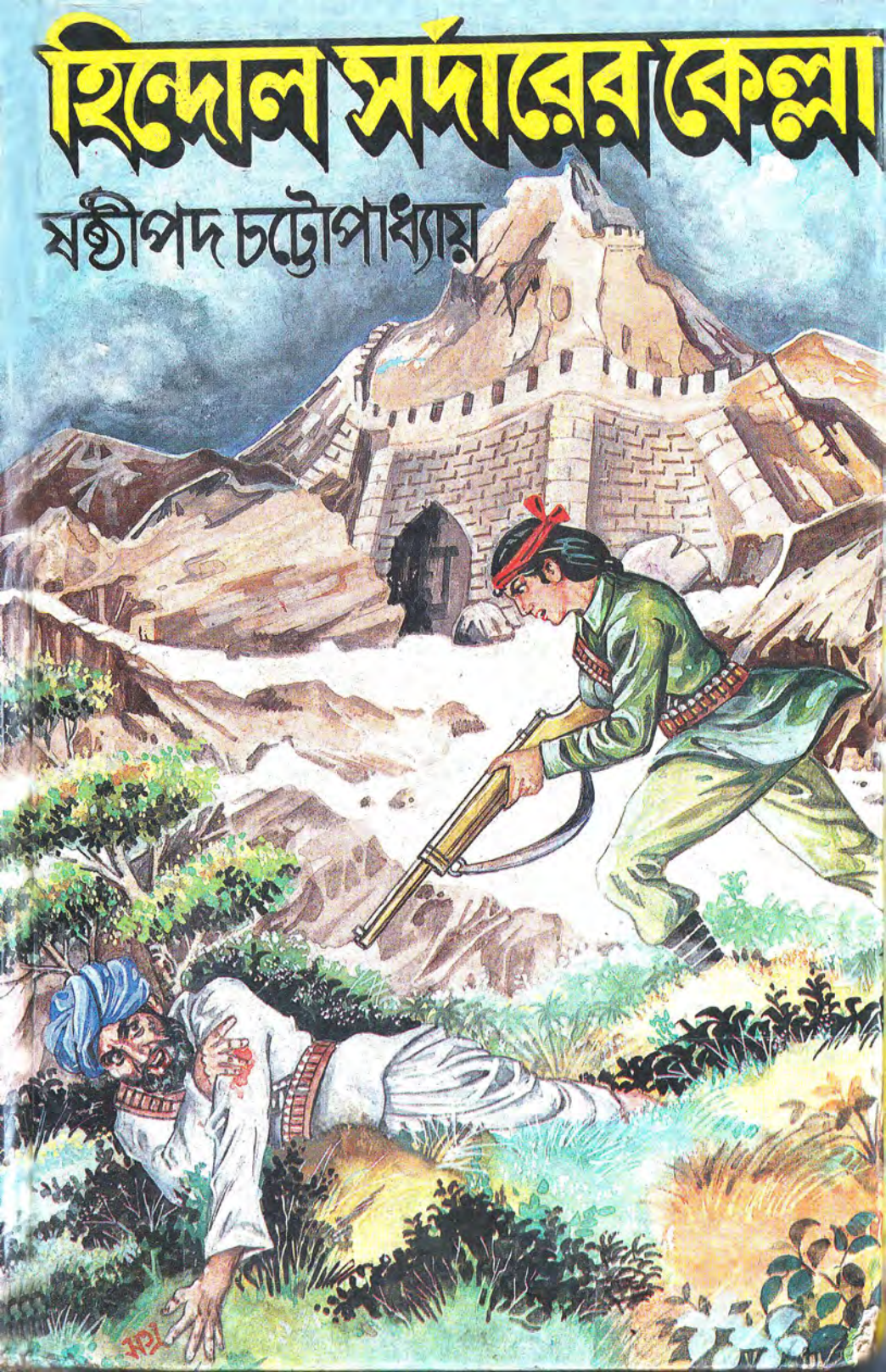

কুণ্ডু ব্যক্তিগত পাঠাগার

www.Banglaclassicbooks.blogspot.in

আমার কথা

বাংলা বইয়ের স্বর্ণখনি আমার সংগ্রহে আছে। যে বইগুলো আমার পছন্দ এবং ইতিমধ্যে ইন্টারনেটে পাওয়া যাচ্ছে, সেগুলো নতুন করে স্ক্যান না করে পুরনোগুলো বা এডিট করে নতুন ভাবে দেবো। যেগুলো পাওয়া যাবেনা, সেগুলো স্ক্যান করে উপহার দেবো। আমার উদ্দেশ্য ব্যবসায়িক নয়। শুধুই বৃহত্তর পাঠকের কাছে বই পড়ার অভ্যেস ধরে রাখা। আমার অগ্রণী বইয়ের সাইট সৃষ্টিকর্তাদের অগ্রিম ধন্যবাদ জানাচ্ছি যাদের বই আমি শেয়ার করব। ধন্যবাদ জানাচ্ছি বন্ধু অস্টিনাস প্রাইম ও পি. ব্যাডস কে - যারা আমাকে এডিট করা নানা ভাবে শিখিয়েছেন। আমাদের আর একটি প্রয়াস পুরোনো বিস্মৃত পত্রিকা নতুন ভাবে ফিরিয়ে আনা। আগ্রহীরা দেখতে পারেন www.dhulokhela.blogspot.in সাইটটি।

আপনাদের কাছে যদি এমন কোনো বইয়ের কপি থাকে এবং তা শেয়ার করতে চান - যোগাযোগ করুন - subhajit819@gmail.com.

PDF বই কখনই মূল বইয়ের বিকল্প হতে পারে না। যদি এই বইটি আপনার ভালো লেগে থাকে, এবং বাজারে হার্ড কপি পাওয়া যায় - তাহলে যত দ্রুত সম্ভব মূল বইটি সংগ্রহ করার অনুরোধ রইল। হার্ড কপি যতে দেওয়ার মজা, সুবিধে আমরা মানি। PDF করার উদ্দেশ্য বিরল যে কোন বই সংরক্ষণ এবং দূর দূরান্তের সকল পাঠকের কাছে পৌঁছে দেওয়া। মূল বই কিনুন। লেখক এবং প্রকাশকদের উৎসাহিত করুন।

There is no wealth like knowledge, No poverty like ignorance

Scan by : Priyanka Gosavi

SUBHAJIT KUNDU

হিজলী সর্দারের কন্যা

ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়

ঃ প্রাপ্তিস্থান ঃ

কামিনী প্রকাশনী

১১৫, অখিল মিস্ত্রী লেন, * কলিকাতা-৯

প্রকাশক ঃ
শ্রীশ্যামাপদ সরকার
১১৫, অখিল মিস্ত্রী লেন,
কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ ঃ
আশ্বিন / মহালয়া ১৩৯৫
অক্টোবর ১৯৮৮

দ্বিতীয় প্রকাশ ঃ
অগ্রহায়ন ঃ ১৩৯৭
ডিসেম্বর ঃ ১৯৯০

প্রচ্ছদ ঃ
সত্য চক্রবর্তী

অলংকরণ ঃ
দিলীপ দাস

মূল্য ঃ পনের টাকা

মুদ্রণ ঃ
শ্রীমথুরমোহন গাঁতাইত
কামিনী প্রিণ্টার্স
১২, যতীন্দ্র মোহন এভিনিউ
কলিকাতা-৭০০০০৬

কবি ও কথাশিল্পী

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়কে

—ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়

ঃ এই লেখকের অন্যান্য বই ঃ

পাণ্ডব গোয়েন্দা

১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ

ভূতের গল্প ভয়ংকর

ভূত আরো ভূত

নকুড়মামা

নকুড়মামার জয়যাত্রা

বিষমভরার বাঘ

দুরন্ত তপাই

দীঘা সৈকতে আতঙ্ক

কিশোর গল্প সংকলন

অভিশপ্ত তিড্ডিম

কাকাহিগড় অভিযান

আদ্যিকালের বদ্যিবুড়ি

গিরিগুহার গুপ্তধন

কালপুরুষের আবির্ভাব

চতুর্থ তদন্ত

মেলা

চন্দনকুমারী

ভাঙা দেউলের ইতিকথা

পলাতকের সন্ধানে

এক

কোন কিছু টের পাবার আগেই যা ঘটবার তা ঘটে গেল। সে রাতে জ্যোছনা ছিল অঢেল। আকাশের গোল চাঁদটাও যেন ট্রেনের গতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ছুটছিল। ছায়া ছায়া কালো কালো দূরের পাহাড় গুলো স্বপ্নের দেশের মতো মনে হচ্ছিল তখন। রঞ্জন অবাক চোখে তাকিয়ে দেখছিল তাই। দ্রুতগামী ট্রেনের চলার ছন্দে হঠাৎই যতিভঙ্গ হ'ল। অনেকটা হোঁচট খাওয়ার মতোই একবার শূন্যে লাফিয়ে উঠল ট্রেনটা। তারপর সব স্থির। সব অন্ধকার।

অনেক পরে যখন জ্ঞান ফিরল তখনো উদ্ধার কার্য শুরু হয়নি। চারিদিকে হতাহত মানুষের দেহ খেলা ঘরের পুতুলের মতো ছড়ানো। যন্ত্রণাকাতর মানুষগুলোর সে কি করুণ আর্তনাদ।

রঞ্জন ধীরে ধীরে উঠে বসল। সর্বাঙ্গে প্রচণ্ড ব্যাথা অনুভব করল সে। মাথাটা এখনো ঝিম ঝিম করছে। আঘাত কি খুবই গুরুতর? না। হাত পা ধড় মুণ্ডু সবই যথাস্থানে ঠিকঠাক আছে। মাথার কাছে স্যুটকেশটা রাখা ছিল। হাত বাড়িয়ে নিতে গেল সেটা। কিন্তু পেল না। কোথায় ছিটকে পড়েছে কে জানে?

ওর সামনের বার্থে মিঃ গোমেশ নামে এক ভদ্রলোক শুয়েছিলেন। বার্থের নিচে ভারি ভারি ট্রাংকগুলো রাখা ছিল তাঁর। সেগুলো যে কোনদিকে কোনটা ছিটকে পড়েছে তা বোঝা গেল না। শুধু মিঃ গোমেশ তাঁর প্রাণহীন দেহটা নিয়ে বার্থের লোহার চেনে ঝুলছেন। কী ভয়াবহ পরিণতি। আর এক ভদ্রলোক, সারা শরীর রক্তে ভেসে যাচ্ছে। মুখে গোঁ গোঁ শব্দ। মাথার খুলি ফেটে—।

এ দৃশ্য দেখা যায় না।

রঞ্জন কোন রকমে এর ওর গায়ে পা দিয়ে উঠে দাঁড়াল। হঠাৎই জানালার ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে দেখল বাইরেটা। একদল লোক মশাল আর টর্চ নিয়ে ছুটোছুটি করছে। নিশ্চয়ই খবর পেয়ে রিলিফ ভ্যান নিয়ে উদ্ধারকারীরা এসে গেছে। কিন্তু একি! ওদের হাতে স্ট্রেচারে শোয়ানো হতাহত মানুষের বদলে মালপত্তর কেন? তবে কি ডাকাতির জন্যই এই দুর্ঘটনা? কালো কালো বলিষ্ঠ চেহারার মানুষগুলোর মাথায় নীল কাপড়ের ফেট্টি বাঁধা। হাতে রক্ত মাখা ধারালো অস্ত্র। উঃ কি ভয়ংকর। রঞ্জন একবার হিপ পকেটে হাত দিয়ে দেখে নিল ওর ওগুলো যথাস্থানেই আছে কিনা, দেখে আশ্বস্ত হল। একশো টাকার দশখানি নোট খুবই যত্ন সহকারে গোঁজা ছিল সেখানে। সেগুলো যথাস্থানেই আছে। আসলে দুস্কৃতরা ছেলেমানুষ ভেবেই হয়তো হাত দিয়ে দেখেনি ওখানে। অথবা বুঝে উঠতে পারেনি এই ধ্বংসস্তুপের এক কোণে একটি তাজা প্রাণ এখনো অবশিষ্ট আছে বলে।

ভোরের আলো ফোটেনি এখনো। সুরু হয়নি পাখিদের কলরব। শুধু চারিদিক থেকেই শোনা যাচ্ছে মানুষের অন্তিম আর্তনাদের সুর। আবছা অন্ধকারে ভরে আছে ভেতরটা। বাইরে ফুটফুটে জ্যোছনা। বন পাহাড় চারিদিকে। তবু এই মৃত্যুপুরীর ভেতর থেকে উদ্ধার পাবার জন্য টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল রঞ্জন। ভেতরে কত যাত্রী যে হতাহত হয়ে রয়েছে তার হিসেব কে রাখে? হাতড়ে হুতড়ে কোন রকমে দরজার কাছে যেতে গিয়েই হঠাৎ ওর কানে এলো —পানি—পানি—থোড়া পানি দিজিয়ে।

মেয়েলি গলার করুন প্রার্থনা।

এই সময় শত বিপদেও, অসুবিধা সত্বেও এই অন্তিম প্রার্থনাকে উপেক্ষা করে কি চলে যাওয়া যায়? কিন্তু জল এখানে পাবে কোথায়? তাছাড়া চারিদিক থেকেই তো ঐ একই প্রার্থনা, জল

দাও—পানি দাও—প্লিজ গিভ মি এ ড্রপ অফ ওয়াটার। কত লোকের মুখে জল দেবে ও? হঠাৎ একটা কিসের ওপর যেন পা পড়ল। দেখল একটা টর্চ গড়াগড়ি খাচ্ছে সেখানে। এই চরম বিপদের মুহূর্তে এই টর্চটা খুবই কাজে লাগবে।

রঞ্জন ঝুঁকে পড়ে টর্চটা কুড়িয়ে নিয়ে চারিদিকে ফেলতে লাগল। হঠাৎই নজরে পড়ল কম্পার্টমেন্টের ভেতরে জানালার পাশের হুকে ঝোলানো ওয়াটার বটলগুলোর দিকে। তারই একটা নিয়ে এসে সাহায্য করতে এগিয়ে গেল ও।

কাছে গিয়ে দেখল একটি ওরই বয়সী মেয়ে এক পাশে মেঝেয় পড়ে কাতরাচ্ছে—পানি—থোড়া পানি দিজিয়ে।

রঞ্জন টর্চ রেখে ওয়াটার বটল থেকে জল নিয়ে মেয়েটির চোখে মুখে ঝাপটা দিল প্রথমে। ওর নাক দিয়ে প্রচণ্ড রক্তক্ষরণ হচ্ছে। মূল্যবান চুড়িদারটা রক্তে ভিজে সপ সপ করছে। দু'একবার ঝাপটা দেবার পর ধীরে ধীরে চোখ মেলে তাকাল মেয়েটি। তারপর বলল —ম্যায় কাঁহা হুঁ? থোড়া পানি—।

রঞ্জন কোন উত্তর না দিয়ে মেয়েটির ঘাড়ের কাছে হাত রেখে মাথাটা একটু তুলে ওয়াটার বটলটা ওর মুখের কাছে ধরল। এক নিঃশ্বাসে সমস্ত জলটুকু পান করে মেয়েটি যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। তারপর রঞ্জনের একটা হাত ধরে উঠে বসবার চেষ্টা করে বলল—তুম কৌন হো?

রঞ্জন বলল—আমিও তোমারই মতো এই ট্রেনের একজন যাত্রী ছিলাম। মাঝ রাত্তিরে ট্রেনটি ভয়ংকর এক দুর্ঘটনায় পড়ে। নেহাৎ মিড্‌ল বার্থে শুয়েছিলাম তাই প্রাণে মরিনি। লোহার চেনে আটকে বেঁচে গেছি।

—আমি লোয়ার বার্থে ছিলাম।

—তার ওপর বিপরীত মুখি হওয়ায় ছিটকে পড়েছ তুমি। নিশ্চয়ই খুব লেগেছে তোমার?

মেয়েটি ঘাড় নেড়ে বলল—হ্যাঁ।

এই অভিশপ্ত ট্রেনের অনেক যাত্রীই বেঁচে নেই। আহত হয়েছেন বহু লোক। আমাদের উদ্ধার করবার জন্য এখনো পর্যন্ত কেউ এগিয়ে আসেনি। কিছু লোক অবশ্য এসেছে লুটপাট করতে কিন্তু তারা আমাদের কোন রকম সাহায্য করবে না।

মেয়েটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল – আমার আব্বাজান ?

—কোথায় তিনি ?

—আপার বার্থে শুয়েছিলেন।

রঞ্জন টর্চ নিয়ে চারিদিকে ঘোরাতে লাগল। কিন্তু না। কোন বার্থেই কেউ নেই।

মেয়েটিও উঠে দাঁড়াল এবার। তারপর আলো ধরে খুঁজতে খুঁজতে দেখতে পেল ওর আব্বাজানকে। সুন্দর স্বাস্থ্যবান এক মধ্যবয়সী ভদ্রলোক ঘাড় গুঁজে পড়ে আছেন একদিকে। তাঁর বুকের ওপর একটি ট্রাঙ্ক চাপা। সেই দৃশ্য দেখে মেয়েটি অধীর হয়ে উঠল। রঞ্জনের সাহায্যে কোন রকমে ট্রাঙ্কটি সরিয়ে তার আব্বাজানের বুকে হাত রাখতেই বুঝল তিনি মৃত। রঞ্জনও স্পর্শ করে দেখল ভদ্রলোকের হিম শীতল অঙ্গ বাস্তবিকই তাঁর মৃত্যু ঘোষণা করছে। মেয়েটি ওর আব্বাজানের বুকের ওপর লুটিয়ে পড়ে আকুল কান্নায় ভেঙে পড়ল।

প্রিয়জন হারানোর বিচ্ছেদ যে কত মর্মান্তিক তা অনুভব করল রঞ্জন। ভাগ্যে ও একা এসেছিল। মেয়েটির কান্না আর থামে না। জোয়ারের গঙ্গার মতো ফুলে ফুলে কাঁদছে মেয়েটি। ওর কান্না থামে না দেখে রঞ্জন বলল—শোনো, এইভাবে কেঁদে কোন লাভ হবে না। চলো, আমরা বরং ট্রেন থেকে নেমে কাছে পিঠে কোন লোকালয় থাকলে সেখানে খবর দিই। তারা নিশ্চয়ই এই রকম দুর্ঘটনার সংবাদ পেলে ছুটে আসবে।

মেয়েটির কিছুতেই তার বাবাকে ছেড়ে যাবার ইচ্ছা হ'ল না। অথচ না গিয়ে উপায়ই বা কি ? রঞ্জন আর একটুও দেরি করতে

রাজি নয়। কেননা আর্ত মানুষের এই অন্তিম হাহাকার কান পেতে শোনা যায় না।

রঞ্জনের বহু অনুরোধে মেয়েটি যখন শেষবারের মতো ওর আববাজানের ললাট চুম্বন করে উঠে দাঁড়াল তখন দেখল আর একজন কে যেন বহু কষ্টে ওদের দিকে এগিয়ে আসছে। ভদ্রলোক প্রবীণ। বললেন—তোমরা কি তোমাদের প্রিয়জনকে হারিয়েছ ?

মেয়েটি বলল—হ্যাঁ।

—আমিও হারিয়েছি। আমার একমাত্র সন্তান এই দুর্ঘটনায় আমাকে ছেড়ে চলে গেছে। তোমরা যদি সুস্থ থাকো তো এই মুহূর্তে পালিয়ে যাও এখান থেকে। চারিদিকে লুটপাট সুরু হয়ে গেছে। তাছাড়া এই চক্করের বাইরে গিয়ে রেলের কাছ থেকে ডেড বডি আদায় করো। এখন কোন মতেই এখানে থেকো না। হয়তো বিপদে পড়ে যাবে।

রঞ্জন বললে—কেন ?

—যা বলছি তাই করো। একেবারে অপারগ না হলে থেকো না। থাকতে নেই। তোমাদের রক্ষা করার দায়িত্ব এখন তোমাদেরই। আর কারো নয়। আমার একটা পা ভেঙে গুঁড়িয়ে গেছে। তবুও আমি চলে যাচ্ছি। হাতের কাছে নিজেদের জিনিসপত্তর যদি কিছু পাও তো নিয়ে নাও। ফেলে রেখে যেও না।

মেয়েটি হয়তো বুঝল ব্যাপারটা। তাই কাঁদতে কাঁদতে ওর বাবার পাঞ্জাবির সোনার বোতাম, রিস্টওয়াচ আর পকেটের টাকাগুলো বার করে নিল। তারপর বহু কষ্টে দরজার হাতল ধরে ওপরে উঠে লাফিয়ে নামল পাশের লাইনে।

এখানে চারিদিকেই শুধু জঙ্গল আর পাহাড়। নিশ্চয়ই কেউ ফিস প্লেট সরিয়ে এই অপকর্মটা ঘটিয়েছে। ওদের মতো আহত অল্প আহত অক্ষত আরো অনেকেই নেমেছে দেখা গেল। কিন্তু মজার ব্যাপার সামান্য কিছু লোক ছাড়া বেশীর ভাগ লোকই

জঙ্গলের পথ ধরে পালাচ্ছে। কেন? কেন পালাচ্ছে ওরা?

মেয়েটির হাত ধরে রঞ্জনও এগোতে শুরু করল।

রঞ্জনের ছোটা অভ্যাস আছে। কিন্তু মেয়েটির? ও কি পারবে ওর সঙ্গে ছুটতে অথবা দ্রুত পা চালাতে? অবশ্য সারা শরীরে প্রচন্ড ব্যাথা এবং আঘাতের অবসাদ নিয়ে দ্রুত পথ চলা খুবই কষ্টকর। তবু ওরা চলতে লাগল।

কিছুটা পথ যাবার পরই হাঁপিয়ে উঠল ওরা। দুজনেরই শ্বাস কষ্ট শুরু হয়েছে। বিশেষ করে মেয়েটির অবস্থা খুবই শোচনীয়। একে সদ্য পিতৃ-বিয়োগে দারুণভাবে ভেঙে পড়েছে মেয়েটি। তার ওপর ব্যাথা বেদনার শরীর নিয়ে পথ চলা একেবারেই অসম্ভব হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে এই পাহাড় জঙ্গলের দেশে।

ওদের সম্মুখের পথটা ক্রমশ উঁচু দিকে উঠে গেছে। অর্থাৎ ওরা মালভূমির মতো অংশে একটা বড় সড় টিলার দিকে এগোচ্ছে। তারই খাড়াই পথের আকর্ষণ হাঁফ ধরাচ্ছে ওদের। এখানে শুধু শিমুল ও মহুয়ার বন। মাঝে মধ্যে দু'একটা ঘন পাতার সেগুন গাছও দেখতে পাচ্ছে ওরা। রঞ্জন মেয়েটির একটি হাত শক্ত করে ধরে আছে।

যেতে যেতে এক সময় মেয়েটি বলল—আর কতদূর যেতে হবে আমাদের? আর যে পারছি না।

রঞ্জনও কি পারছে? ওরও পা দুটো যেন ভারি অসুখ থেকে উঠলে যেমন হয় সেই রকম ভেরিয়ে পড়ছে। নাহলে এই ফুলের মতো মেয়েটিকে পিঠে নিয়েই চা বাগানের কুলির মতো উঠে যেত ঠিক। রঞ্জন তো আর পাঁচটা ছেলের মতো নয়। রীতিমতো শরীর চর্চা করে। ওর হাতের একটা চড় অথবা ঘুসি হজম করা অনেক শক্তিমান লোকের পক্ষেও অসম্ভব। তবওু এই দুর্ঘনার পর কি যে হয়ে গেল। সব সময় যেন মাথাটা ঝিম ঝিম করছে। হাত খুব বেশী জোরে মুঠো করতে পারছে না। পা কাঁপছে। এক এক সময় মনে হচ্ছে সত্যি সত্যিই ও বেঁচে আছে তো? এই চাঁদনি রাতের জ্যোছনা

লোকে শিমুল মহুয়ার বনে টিলা পাহাড়ে এক অনাত্মীয় কিশোরীর হাত ধরে পথ চলা এ তো স্বপ্নময়।

মেয়েটি বলল—আর যে পারছি না। উঃ কি কষ্ট।

মেয়েটি বসে পড়েই একটি পাথরের বুকে·· পৃঃ—১২

—আর একটু। এই টিলাটার ওপরে উঠে একটু বিশ্রাম নেবো আমরা।

—আমি আর পারছি না।

—আমিও পারছি না। তবু এসো। একটু কষ্ট করে চলে এসো এটুকু পথ।

রঞ্জন মেয়েটির দেহের ভার অনেকটা নিজের ওপর নিয়ে নিল। মেয়েটির চুল এলিয়ে পড়েছে। সে ওর মাথাটা রঞ্জনের কাঁধের ওপর কাত করে রেখে টলতে টলতে উঠতে শুরু করল বাকি পথটুকু।

পথ শেষ হল এক সময়।

তারায় ভরা আকাশের নিচে লাল টিলার মাথার ওপর বন জ্যোছনা গায়ে মেখে ধুপ ধাপ বসে পড়ল দুজনে। আঃ কি নীবিড় শান্তি এখানে। মেয়েটি বসে পড়েই একটি পাথরের বুকে 'হায় আল্লা' বলে লুটিয়ে পড়ল।

রঞ্জনের কিশোর মন এই অনাত্মীয় কিশোরীর বিয়োগ বেদনা দেখে ব্যথিত হল। ওর চোখ দুটো অশ্রুসজল হয়ে উঠল এবার। ওর মা বাবা সঙ্গে থাকলে আজ তাদের ভাগ্যেও এই রকম করুণ পরিণতি জুটত কিনা কে জানে? প্রত্যেক যাত্রায় প্রতিটি মানুষের নিয়তি নির্ধারণ করা থাকে। এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয় নি। মানুষ নিয়তির দাস। এই কিশোরী কোথায় যাচ্ছিল কে জানে, ট্রেন ভ্রমণের আনন্দময় অভিযানের আগে স্বপ্নেও কি ভেবেছিল যে নিঠুর নিয়তি এই মায়া ভরা জ্যোছনা রাতে এই বনে পাহাড়ে তার মায়াকাঠি দিয়ে ওর আব্বাজানকে ওর বুক থেকে ছিনিয়ে নেবে বলে?

এতক্ষণ মনে উত্তেজনা থাকায় মেয়েটির দিকে ভালো করে নজর দিতে পারেনি রঞ্জন। এখন রাত্রি শেষের জ্যোছনালোকে খুব ভালো করে দেখল ওকে। মনে হল যেন এই বাসন্তী পূর্ণিমার রাতে শিলাখণ্ডের ওপর লুটিয়ে পড়া ঐ কিশোরী মেয়ে নয়। শরতের একরাশ শুভ্র শেফালী। সাদা কাগজের মতো গায়ের রঙ। যেন একটা শ্বেতকবুতর কিশোরীর শরীর পেয়ে এই বন জ্যোছনায়

ফুট ফুট করছে। এত ফর্সাও কেউ হয়? এর ওপর জ্যোছনার আলো পড়ে মেয়েটি যেন দুধ সাগরে ভাসছে। কতই বা বয়স হবে? খুব জোর বছর পনেরো। রঞ্জনেরই সমবয়সী। দেখে মনে হয় অবস্থাপন্ন ঘরেরই মেয়ে। ওর রক্তে ভেজা চুড়িদার সস্তা কাপড়ের নয়। পায়ে জুতো নেই। খুলে রেখে শুয়েছিল হয়তো। কোথায় ছিটকে গেছে কে জানে? রঞ্জনও খালি পা। ঐ অন্ধকারে আর ঐ ভয়াবহ দুর্ঘটনার পর জুতো খোঁজার ব্যাপারটা ওরও মনের কোণে উদয় হয়নি।

রঞ্জন কিশোরীর খুব কাছে এগিয়ে গিয়ে সস্নেহে ওর মাথায় গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলল—এই শোনো। এভাবে কেঁদো না। অ্যাক্সিডেণ্ট ইজ অ্যাক্সিডেণ্ট। এটাকে কঠিন ভাবে মেনে নাও। যা হবার তা বেশ ভালো ভাবেই হয়ে গেছে। এখন একটু বিশ্রাম নিয়ে চলো আমরা শহরের দিকে যাই।

মেয়েটি এক হাতে ওর কপালের ওপর লুটিয়ে পড়া চুলগুলো সরিয়ে দিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তারপর সেও পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখল তার উদ্ধারকর্তা এই বন্ধুটিকে। এক সময় শান্ত গলায় বলল—না। আর কাঁদব না। আমার সব কান্নার শেষ হয়ে গেছে। তোমায় ধন্যবাদ। তুমি আমায় ঐ নরক থেকে মুক্ত করে এনেছো। তুমি না থাকলে হয়তো ঐ প্রেতপুরীতে আমিও মরে পড়ে থাকতাম। এক নিঃশ্বাসে কথাগুলি বলে নিজের রক্তভেজা পোষাকের দিকে তাকাল।

রঞ্জন বলল—কাল সকালেই শহরে গিয়ে আগে তোমার জন্য একটা নতুন স্কার্ট বা চুড়িদার কিনব। ওটা পরে তো পথ চলা যাবে না।

মেয়েটি বলল—তুমি কোন আঘাত পাওনি তো?

—পেয়েছি। সামান্য। মাথায় খুব জোর লেগেছে।

—তাহলে তোমার জামার ঐ রক্ত!

—ও তোমারই। আমরা এক সঙ্গে আসছিলাম, তাই লেগে গেছে।

—এখানে কোথাও কি জল পাওয়া যাবে? তাহলে আপাততঃ একটু ধুয়ে নিতাম।

এমন সময় কাছেরই একটি গাছের ডাল থেকে কুহু কুহু করে একটা কোকিল ডেকে উঠল। তারপর একটি দুটি করে পাখি। তার মানে ভোর হয়ে আসছে।

রঞ্জন বলল—পূবের আকাশে সামান্য একটু লালাভা দেখা দিচ্ছে। গাছে গাছে পাখি ডাকছে। রাতের শেষ। দিনের সুরু। চলো আমরা নীচে নামি। টিলার ওপারে নীচের দিকে একটা পাহাড়িয়া নদী আছে মনে হচ্ছে। আমরা ওখানেই যাই। মুখ হাত ধুয়ে নিই। জামা থেকে রক্তের দাগ তুলি। তারপর বাড়ি ফেরার ব্যবস্থা করা যাবে। ট্রেন তো চলবে না। অন্য কিছু যদি ম্যানেজ করা যায় তো সেই ব্যবস্থা করতে হবে।

মেয়েটি বলল—তাই চলো। দূরের ঐ নদীর জলে আমরা একটু পরিস্কার হয়ে নিই। তারপর কাছে পিঠে কোন শহরে গিয়ে বাড়িতে একটা তার করব।

রঞ্জন বলল—সেই ভালো।

মেয়েটি উঠে দাঁড়াতে গেল কিন্তু পারল না। খানিক উঠেই ধপ করে বসে পড়ল। বলল—পায়ে বড় ব্যাথা। খালি পায়ে হাঁটা অভ্যেস নেই। কি করে যে যাবো তা জানি না।

রঞ্জন ওর হাত ধরে টেনে তুলল।

এই অপূর্ব প্রাকৃতিক পরিবেশে এমন এক কিশোরী সঙ্গীনি পেলে যে কোন কিশোরই মনে জোর পায় খুব। বলল—আস্তে আস্তে এসো। কোথাও ওষুধের দোকান থাকলে দু'চারটে ট্যাবলেট খেলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

মেয়েটি ওর হাত ধরে ধীরে ধীরে পথ চলতে লাগল।

রঞ্জন বলল—যদি কিছু মনে না করো, একটা কথা বলি ?

—কি কথা বলো।

—আমরা দুজনে এতক্ষণ আছি কিন্তু কেউ কারো নাম জানি না। এটা কি ঠিক ?

মেয়েটি মরা চাঁদের মতো ম্লান হেসে বলল—না। মোটেই ঠিক নয়। কি নাম তোমার ?

—আমার নাম রঞ্জন।

—তুমি হিন্দু। আমার নাম শবনম। আমি মুসলমান। আমি কলকাতায় পার্কসার্কাসের কাছে পার্লষ্ট্রীটে থাকি।

—আমি থাকি বালিগঞ্জে ম্যাণ্ডিভিলা গার্ডেনে।

—ওখানে আমার এক বান্ধবী থাকে।

—আমার কিন্তু কোন বান্ধবী কোথাও থাকে না।

—সেকি ! তোমার বান্ধবী তো এখন তোমার পাশেই আছে। মুসলমানের মেয়ে বলে আমি কি পারি না কোন হিন্দু ছেলের বান্ধবী হতে ?

—কেন পারো না ? আমাদের ঈশ্বর বা তোমাদের আল্লার কাছে সত্যিই কি কোন ভেদাভেদ আছে ? সবার রক্তের রঙই তো লাল। এই দেখো না তোমার রক্ত আমার গায়ে, আমার জামায় লেগে আছে।

—তুমি বড় ভালো।

—তুমিও। তোমার মতো মেয়ে আমি কখনো দেখিনি। ঈশ্বর করুন তোমার সঙ্গে আমার বিচ্ছেদ যেন কখনো না হয়। বাড়িতে তোমার কে কে আছে শবনম ?

—আমার কেউ নেই। মা মারা গেছেন ছেলেবেলায়। আব্বাজান আর আমি। আমার দাদা ছিল। সে মাফিয়া দলের সঙ্গে মিশে উচ্ছন্নে গেছে। আব্বা তার মুখ দেখেন না। চাচা চাচি আছেন। লোক সুবিধের নয় তাঁরা।

—আমিও আমার বাবার একমাত্র সন্তান বলতে পারো। আমার বড় দিদি ছিলেন। তিনি মারা গেছেন গত বছর। আমার দিদির ছেলেরা খুব ছোট। একজনের বয়স ছ' বছর। একজনের চার। আমি সম্বলপুরে তাদের কাছেই যাচ্ছিলাম।

—আমি আব্বার সঙ্গে যাচ্ছিলাম হীরাকুদে।

এমন সময় গাছ পালার আড়াল থেকে জনা চারেক লোক বেরিয়ে এসে বলল—তা তো যাচ্ছিলে। কিন্তু তোমার হাতে ওগুলো কি বাবা ?

ওরা দুজনেই চমকে উঠল এই নির্জন টিলায় ঐ গুণ্ডাকৃতি আগন্তুকদের দেখে।

শবনমের হাতে ওর আব্বাজানের ঘড়ি, বোতাম আর মানিব্যাগটা ছিল। একজন এসে ছিনিয়ে নিল সেটা।

আর একজন বলল—বেশ জায়গাটি বেছে নিয়েছ বাছাধনরা। ভেবেছো এখানে এসে গা ঢাকা দিলে কেউ আর দেখতে পাবে না তোমাদের। কিন্তু এটাই যে আমাদের স্বর্গরাজ্য। তা বুঝি জানতে না ?

রঞ্জন বুঝল লোকগুলোর মুখ দিয়ে বিশ্রী গন্ধ ছাড়ছে। তার মানে নেশা করেছে ওরা। চারজনের মধ্যে দুজন খুবই অপ্রকৃতিস্থ।

রঞ্জন বলল—এটা স্বর্গই হোক আর নরকই হোক। যেগুলো নিয়েছ সেগুলো ফেরৎ দাও।

—চুপ কর বদমাস কোথাকার। মেরে মুখ ভেঙ্গে দেবো। এক ফোঁটা ছেলে মেয়ে এই বয়সেই চরতে শিখেছ ? রাতের অন্ধকারে বনে জঙ্গলে ঘুরতে এসে সুরু করেছ ছিনতাইবাজি ?

রঞ্জন বলল—আমরা ছিনতাইবাজি করতে এসেছি, না তোমরাই লুটপাট করবার জন্যে রাতের অন্ধকারে ফিসপ্লেট সরিয়ে নিয়েছিলে লাইন থেকে ?

লোকগুলো এবার গম্ভীর মুখে পরস্পরের মুখ চাওয়া চায়ি

করতে লাগল। তারপর একজন এগিয়ে এসে বলল—তুই কি ম্যানেজ করেছিস দেখি ?

রঞ্জন বলল—এই দেখ। বলেই সে সজোরে লোকটার তলপেটে একটা ঘুসি মারল।

মারার সঙ্গে সঙ্গেই মুখটা বিকৃত হয়ে জিভটা ঝুলে পড়ল লোকটির। ঠোঁটের কষ বেয়ে গল গল করে রক্ত বেরিয়ে আসতে লাগল।

একটি কিশোর বয়স্ক ছেলের হাতে একজন সঙ্গীর ঐ রকম দুর্দশা দেখে বাকি তিনজন থতিয়ে গেল প্রথমে। ওদেরই একজন পিছন দিক থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ল রঞ্জনের ওপর। কিন্তু এই কিশোরের শারীরিক শক্তি এবং যুযুৎসুর প্যাঁচের নমুনা জানা ছিল না বাছাধনদের। তাই নিমেষে লোক দুটোকে ধরাশায়ি করে আবার রুখে দাঁড়াতেই একজনের লাথির ঘায়ে ছিটকে পড়ল ও। সেই সময়টুকুর মধ্যেই বাকি দুজন ওর পকেট হাতড়ে যা যেখানে ছিল সব কিছু সাফ করে নিল। রঞ্জন বাধা দেবার আর কোনরকম সুযোগই পেল না। উপরন্তু একজন দু'হাতে সজোরে ওর গলাটাকে টিপে ধরল।

এই আকস্মিক বিপদে হতভম্ব হয়ে শবনম বেচারা বোবার মতো দাঁড়িয়ে ভয়ে থর থর করে কাঁপছিল। কিন্তু এই মুহূর্তে রঞ্জনের অবস্থা দেখে শিউরে উঠল ও। ওদের অন্যমনস্কতার সুযোগ নিয়ে একটা বড় পাথর কুড়িয়ে যে লোকটা রঞ্জনের গলা টিপে ধরেছিল তার মাথার ওপর সজোরে বসিয়ে দিল। এক ঘা-ই যথেষ্ট। ভারি পাথরের আঘাতে মাথাটা গুঁড়িয়ে গেল একেবারে।

বাকি রইল আর দুজন। ক্রুদ্ধ কুকুরের মতন এগিয়ে এলো তারা শবনমের দিকে। বলল—তবে রে শয়তান মেয়ে।

একজন বলল—আয় তোকে পাহাড় থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিই।

আর একজন বলল—না। ওকে মেরে ফেললে চলবে না।

ওর গায়ের রঙ মুখশ্রী দেখেছিস ? বড় হলে ও নুরজাহান হবে। আমাদের সঙ্গেই ওকে নিয়ে চলে যাই চল।

শবনম বলল—খবরদার। এক পাও এগোবে না বলছি আমার দিকে। খুব সাবধান। আমি কিন্তু জ্যান্ত গোখরো সাপ। এমন ছোবল দেবো যে তা ভাবতেও পারবে না।

কিন্তু চোরা নাহি শোনে ধর্মের কাহিনী। যাদের বলা হ'ল তারা কর্ণপাতও করল না শবনমের কথায়। একজন এসে জোর করে কাঁধে উঠিয়ে নিল শবনমকে।

শবনম চিৎকার করতে লাগল—ছাড়ো ছাড়ো। ছাড়ো বলছি আমাকে। ছেড়ে দাও। রঞ্জন !

রঞ্জন তখন অতি কষ্টে আবার উঠে বসতে যাচ্ছে। কিন্তু যতবার উঠতে যাচ্ছে ততবারই পড়ে যাচ্ছে ও।

শবনম তখনো চিৎকার করছে—আমাকে বাঁচাও ! রঞ্জন ! এরা আমাকে তুলে নিয়ে যাচ্ছে।

যে লোকটি ওকে কাঁধে নিয়েছিল সে বলল—তোমার রোমিও এখন হাজার চেষ্টা করলেও তোমাকে বাঁচাতে আসবে না জুলিয়েট। এখন চলো তুমি আমাদের গুহা তীর্থে বন্দিনী হবে বলে।

শবনম বলল—এখনো বলছি তুমি আমাকে ছেড়ে দাও। নাহলে তুমি মরবে।

—কে মারবে আমাকে ! তোমার রোমিও ?

—ও নয়। আমিই মারব তোমাকে। বলার সঙ্গে সঙ্গে যা করবার তা করে ফেলল শবনম।

লোকটি যেন সাপের ছোবল খেয়ে চিৎকার করে উঠল। দেখা গেল নিজের গুপ্তস্থান থেকে ছোট্ট একটি পেনসিল কাটা ছুরি দিয়ে লোকটার গলার নালি দু'ফাঁক করে দিয়েছে শবনম।

ততক্ষণে রঞ্জনও উঠে দাঁড়িয়েছে। ওরও নাকে মুখে রক্ত। কপালের একটা পাশ কেটে গেছে।

আক্রমণকারী দলের বাকি একজন দারুণ বিপাকে পড়ে গেল দুপাশ। দুটি কিশোর কিশোরীর হাতে ওর তিন সঙ্গীর ঐ দুর্দশা

মাথার ওপর সজোরে বসিয়ে দিল ··পৃঃ—১৭

দেখে আর এগোতে সাহস করল না সে। এবার এক পা এক পা করে পিছু হটতে লাগল তাই।

ছোট্ট ছুরির তীক্ষ্ণ ফলাটা হাতে নিয়ে শবনমও কেউটে সাপের মতো হিল হিল করে এগোতে লাগল ওর দিকে—আয় না। কাছে আয়। পালিয়ে যাচ্ছিস কেন?

লোকটি এবার পিছু হটতে হটতে প্রাণের দায়ে দৌড়তে লাগল।

আকাশের পট থেকে শেষ রাতের সমস্ত গ্লানি মুছে গেছে তখন। জ্যোছনা রাতের যদিও গ্লানি থাকে না তবুও দুধ ফিকে অস্পষ্টতা যেটুকু ছিল সেটুকুও পরিস্কার হয়ে গেল।

কি অপূর্ব প্রাকৃতিক পরিবেশ এখানকার। চারিদিকে পাহাড়ের ঢেউ। সবুজ বনানী। তীরে শিমুল পলাশে রাঙা গহন বন রাজি। গাছে পাখির ডাক। কি চমৎকার।

রঞ্জন টলতে টলতে এসে শবনমের একটা হাত ধরল। ওর চোখের কোলে চিক চিক করছে মুক্তোর মতো জল।

শবনম বলল—তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে, রঞ্জন ?

—হ্যাঁ। প্রচণ্ড মার দিয়েছে ওরা। গলাটা এত জোরে টিপে ধরেছিল যে এখনো লাগছে। তাছাড়া ওরা আমার সব টাকাগুলোও কেড়ে নিয়েছে।

—আমারও। এখন কি করি বলতো ?

—কি আর করবে ? আপাততঃ লোকালয়ে যাই চলো।

ওরা উঁচু টিলার ঢাল বেয়ে নিচে নামতে লাগল। হঠাৎই কি মনে পড়ে যেতে শবনম বলল—রঞ্জন, আমার মনে হয় ঐ লোকগুলোর পকেট হাতড়ালে হয়তো আমাদের খোয়া যাওয়া জিনিস পত্তরগুলো পাওয়া যেতে পারে।

রঞ্জন বলল—ঠিক বলেছ তো। চলো চলো। ওদের চারজনের তিন জনকেই আমরা শেষ করে দিয়েছি। বাকি একজন কি সব নিয়ে পালাতে পেরেছে ?

শবনম রঞ্জনকে বলল—তুমি একটু ধীরে ধীরে এসো। আমি ততক্ষণ দেখছি।

রঞ্জন বলল—তাই যাও। যা করবার তাড়াতাড়ি করো। নাহলে লোকজন এসে পড়বে এখুনি। ভোর হয়েছে। সকাল হতেও বেশি দেরী নেই। কেউ আসার আগেই কেটে পড়তে হবে আমাদের। নাহলে খুনের দায়ে ধরা পড়ব আমরা।

শবনম অত্যন্ত চতুরা। এই কৈশোর বয়সেই তার বুদ্ধি সাহস এবং কর্ম তৎপরতা সত্যিই প্রশংসা করবার মতো। সে ক্ষিপ্র গতিতে তিনজনের দেহ উল্টে পাল্টে পকেট হাতড়ে অনেক কিছুই বার করে ফেলল।

রঞ্জন এসে উদ্ধার করল শবনমের আব্বাজানের সোনার বোতামটা। পাওয়া গেল না শুধু ঘড়ি আর মানি ব্যাগ। রঞ্জনের টাকাগুলো যে হাতিয়েছিল তার মাথা তো উড়িয়ে দিয়েছিল শবনম। কাজেই সেগুলো উদ্ধার করতে খুব একটা কষ্ট হল না।

এমন সময় ওরা বহু দূর থেকে দুম দাম শব্দ শুনতে পেল।

শবনম বলল—ও কিসের শব্দ?

—মনে হয় গুলির। ব্লাঙ্ক ফায়ার করে রেলপুলিশ নিশ্চয়ই দুর্ঘটনাস্থল থেকে লোকজন সরাচ্ছে।

—তার মানে রেসকিউ পার্টির লোকেরা এসে গেছে?

—মনে হয়।

—রঞ্জন! আমার আব্বাজান?

—দুঃখ কোর না শবনম! এই পাহাড় জঙ্গলের দেশ থেকে কলকাতার পথে আপাততঃ আমরা পাড়ি দিতে পারব না। বরং চলো কোথাও থেকে তার করে যে যার বাড়িতে আমাদের অবস্থার কথা জানাই। তোমার আব্বাজানকে পেলেই বা এখন তুমি কি করবে? তুমি আমি দুজনে কি পারব তাঁর মৃতদেহ ফিরিয়ে নিয়ে যেতে?

শবনম একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল—এসো। টিলার নীচে ঐ নদীতে গিয়ে বরং আমরা আগে একটু পরিষ্কার হই।

রঞ্জন নিজের টাকা আব্বাজানের বোতাম ছাড়াও ওদের পকেট হাতড়ে যা কিছু পেয়েছিল সব নিজের কাছে রেখে দিল। বলল—বলা যায় না, এই কাগজ পত্রের ভেতর দিয়েই হয়তো ওদের পরিচয় এবং অনেক গোপন তথ্য পেয়ে যাবো। আর সেগুলো পুলিশের হাতে তুলে দিলে নিশ্চয়ই দুষ্কৃতীরা দলকে দল ধরা পড়বে।

—ঠিক বলেছ তুমি। আল্লা করেন যেন তাই হয়। দলকে দল ধরা পড়ে ওরা। আমরা তো তিনজনের বদলা নিয়েইছি।

ওরা আর একটুও বিলম্ব না করে সেই ঘন গাছপালায় ভরা উচ্চ টিলার ওপর থেকে নীচে নেমে এলো। একেবারে নীচে নেমে আসার পর দেখল ছোট্ট একটি গিরিনদী এঁকে বেঁকে পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে অশান্ত গতিতে বয়ে চলেছে।

শবনম বলল—তুমি এইখানে একটু আড়ালে বসে থাকো। আমি ততক্ষণ এগুলো পরিষ্কার করে নিই।

রঞ্জন বসে রইল।

সামান্য কিছু সময়ের মধ্যেই মুখ হাত ধুয়ে পোষাকে লেগে থাকা রক্তের দাগ মুছে উঠে এলো শবনম। বলল—এবার আমি বসি, তুমি যাও।

রঞ্জন বলল—তা তো যাবো। কিন্তু এই সাত সকালে একেবারে সব যে ভিজিয়ে ফেললে তুমি। এখন উপায়?

—উপায় আর কি বলো? আমি তো তোমার মতো ছেলে নই। নাহলে খালি গায়ে থাকতাম। গায়ে জল বসুক আর যাই হোক ভিজে জামাই পড়ে থাকতে হবে।

সত্যিই তো। উপায় কি?

রঞ্জন নিজেও এবার নদীতে নেমে মুখ হাত ধুয়ে পরিষ্কার হল। ওর জামাতেও যে সব জায়গায় রক্তের দাগ লেগেছিল সে গুলো পরিষ্কার করল। পরিষ্কার করতে গিয়ে নিজের জামাও ভিজিয়ে ফেলল রঞ্জন। তারপর ভিজে জামা গায়ে দিয়েই উপরে উঠে এলো।

ঠিক এই সময়ই পাহাড়ের ঘন শাল বনের ভেতর থেকে প্রভাত সূর্যের আলোর ছটা ওদের গায়ে এসে পড়ল। গাছের সবুজ পাতায় লাল আলো কি অপরূপ।

ইতিমধ্যেই চারিদিকে লোকজনের চলাচল সুরু হয়েছে। তবে

তা নেহাৎই দেহাতি লোকজনের। ওরা সেই পথে যেতে যেতে বনের ভেতর হঠাৎ একটা মন্দির দেখতে পেল।

রঞ্জন বলল—যাক বাবা, বাঁচা গেছে। ঐখানে উঠে ওদের আশ্রয়ে যে ভাবেই হোক একটু থাকার ব্যবস্থা করে নেবো। তারপর জানাবো কোন সরকারী বেসরকারী অফিস অথবা পোস্ট অফিস থেকে টেলিফোন করব বাড়িতে।

শবনম বলল—হ্যাঁ। নাহলে আজকের কাগজে এই দুর্ঘটনার কথা যদি ছাপা হয়ে থাকে তাহলে সবাই খুব চিন্তা করবে। আর মাসীমাকে খবর না দিতে পারলে আমার আববাজানের ডেড বডিও বেপাত্তা হয়ে যাবে।

—আমার সন্দেহ হচ্ছে কি জান শবনম, হয়তো শেষ পর্যন্ত তোমার আববাজানের ডেড বডি পাওয়াই যাবে না।

—পাওয়া যাবে না! কেন?

—তা জানি না। তবে শুনেছি রেল দুর্ঘটনায় এই রকমই নাকি হয়।

কথা বলতে বলতে ওরা সেই মন্দিরের কাছে এসে পড়ল। মন্দিরের বাইরের গেটে লেখা আছে গোবিন্দজীর মন্দির। বেশ অনেকখানি জায়গা জুড়ে মন্দিরটা। কয়েকটি তালা বন্ধ ঘরও রয়েছে।

রঞ্জন বলল—এই খানেই আমরা আজকের মতো আশ্রয় নেবো। তারপর এদের সাহায্য নিয়ে যা করবার করব।

মন্দিরের সেবায়েৎ গিরিধারীজী ওদের দেখে হাসি মুখে এগিয়ে এলেন। যদিও অবাঙালি, তবুও পরিষ্কার বাংলায় বললেন—এসো এসো। ভেতরে এসো।

শবনম ও রঞ্জন ভেতরে ঢুকল।

গিরিধারীজী বললেন—একি! তোমাদের এই রকম অবস্থা কেন? এই সাত সকালে ভিজে কাপড়ে ব্যাপারটা কি?

রঞ্জন বলল—পূজারীজী, আমরা মাত্র একদিনের জন্য আপনার এখানে আশ্রয় চাই। আজ আপনার মন্দিরে আমাদের দুজনের জন্য প্রসাদের ব্যবস্থাও করতে হবে। যা লাগে দেবো আমরা। খুব বিপদ আমাদের।

গিরিধারীজী সস্নেহে বললেন এবার—প্রসাদ জরুর মিলেগা। লেকিন তুম দোনো কৌন হো? কাঁহাসে আ রহে হে তুম! কিসের বিপদ তোমাদের?

রঞ্জন বলল—কাল রাত্রে ঐ টিলার ওপরে যে বন সেইখানে এক গুরুতর রেল দুর্ঘটনা হয়েছে।

—হাঁ হাঁ শুনা। বহুৎ আদমিকা নিধন হো চুকা।

—আমরাও ঐ রেলের যাত্রী ছিলাম। ঐ দুর্ঘটনার পর ভয়ে পালিয়ে এসেছি আমরা।

—আঃ হা। বড়ি আফশোস কি বাত। ঠিক হ্যায়। মাৎ ডরো। হিঁয়া ঘর ভি মিলেগা, খানা ভি মিলেগা। এ লেড়কি তুমহারা কৌন হ্যায়?

—বহিনকা মাফিক।

—বহিন কা মাফিক? বহিন নেহি? বলেই ডাকলেন—জানকি বেটি? এ জানকি বেটি?

ভেতর থেকে উত্তর এলো-যাতে হেঁ।

গিরিধারীজী বললেন—জলদি আ যাও। তারপর রঞ্জনকে বললেন-খুব জোর অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে শুনলুম। কোন আদমিকে ওখানে যেতে দিচ্ছে না পুলিশ?

রঞ্জন বলল—না। তারপর বলল, একটু বেলায় এখানে কোথাও থেকে বাড়িতে একটা ট্রাংকল করা যাবে?

—হাঁ হাঁ। নিশ্চয়ই করা যাবে।

এমন সময় মধ্যবয়সী এক মহিলা সম্ভবতঃ জানকি বিটিয়া এসে দাঁড়ালেন সেখানে। তারপর ওদের দেখে কতকটা নিজের মনেই

যেন আস্তে করে বললেন—দোনো কাঁহাসে আ গিয়া ?

গিরিধারীজী বললেন—দুর্ঘটনা সে ফাঁস গয়া বেচারা। যাও কুছ খানা লে আও।

জানকি বিটিয়া একটু সময়ের মধ্যেই দুটো প্লেটে দুটো করে মুগের লাড্ডু আর ভালো ঘিয়ের হালুয়া নিয়ে এলেন।

গিরিধারীজী বললেন—তোমরা কলকাতা থেকে আসছ নিশ্চয়ই ? পাথুরেঘাটার দুনিচাঁদবাবুকে চেনো ?

রঞ্জন বলল—না।

জানকি বিটিয়া বললেন—ইয়ে মন্দির উনহোনে বনায়া।

গিরিধারীজী বললেন—যাও, ও বগলবালা ঘর ও লেড়কাকো দে দো। আউর লেড়কিকো সাথ রাখো তুমহারা। আচ্ছা সে দেখ ভাল করো।

রঞ্জন বলল—ওর সব কিছু ভিজে গেছে। দয়া করে ওকে একটা শুকনো কিছু পরবার জন্য দিন।

গিরিধারীজী বললেন—চিন্তা মাৎ করো বেটা। এটা দেবস্থান। গোবিন্দজীর মন্দিরে যখন এসে পড়েছ তখন সব কিছু ব্যবস্থা হয়ে যাবে তোমাদের। দরকার হলে আমিই তোমাদের বাড়িতে খবর পাঠাবো। ভাবনা করো না। তারপর বললেন—ক্যা নাম হ্যায় তুমহারা ?

—আমার নাম রঞ্জন রায়।

—আর উস লেড়কি কো ?

—শবনম।

বিনা মেঘে যেন বজ্রাঘাত হয়ে গেল। লাফিয়ে উঠলেন গিরিধারীজী—কেয়া নাম বতায়া ? শবনম ?

শবনম বলল—হ্যাঁ।

—মহামেডান !

—জী হ্যাঁ।

—নিকালো, নিকালো, আভি নিকালো হিঁয়াসে। এটা গোবিন্দজীর মন্দির। বাবু জানতে পারলে আমার নোকরি থাকবে না। হিন্দুর মন্দিরে মুসলমানের কোন স্থান নেই। অন্য কোথাও রাস্তা দেখো তোমরা।

খাওয়া অর্ধ পথেই রইল। রঞ্জন মুখের গ্রাস নামিয়ে বলল—সে কি পূজারীজী! এই অচেনা জায়গায় আমরা কোথায় রাস্তা দেখব? শুধু মুসলমান হওয়ার অপরাধে এই ফুলের মতো মেয়েটা হিন্দুর মন্দিরে আশ্রয় পাবে না?

—না পাবে না। বলেই শবনমকে বললেন—তুমি এখুনি মন্দিরের বাইরে চলে যাও।

শবনমের দু'চোখে জল এলো।

রঞ্জন দুঃখ করে বলল—পূজারীজী, আপনি যে গোবিন্দজীর সেবা করছেন সেই গোবিন্দজীরই উপাসক চৈতন্যমহাপ্রভু যবন হরিদাসকে তাঁর বুকের মাঝে আশ্রয় দিয়েছিলেন। আর আপনি? ছিঃ ছিঃ ছিঃ।

—আরে থামো। ফালতু বকোয়াস মাৎ করো ছোকরা। ভাগো হিঁয়াসে।

রঞ্জন না খেয়েই উঠে দাঁড়াল। তারপর থুঃ করে একটা থুতু ফেলে চলে এলো মন্দির থেকে।

শবনম কাঁদছিল।

রঞ্জন বলল—কেঁদো না। আমাদের পুরোহিত ব্রাহ্মণরা এই রকমই। আমাদের সংস্কারও এই রকম। এখন চলো যেদিকে লোক বসতি আছে সেই দিকে যাই।

শবনম বলল—আমার জন্যে তুমিও আশ্রয়হীন হলে। তার চেয়ে তুমি থাকো, আমি যাই।

ছিঃ শবনম। তুমি আমাকে এত হীন ভাবলে? মন্দির আর মসজিদের মহিমা ওরা কি বুঝবে? তা যদি বুঝত তাহলে কি এত

কষ্ট থাকত মানুষের ? যিনি খৃষ্ট তিনি কৃষ্ণ তিনিই আল্লা এই সরল সত্যকে যুগে যুগে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন আমাদের মনীষিরা। তবুও আমাদের মাঝে এর এত ভেদা ভেদ। তুমি কিছু মনে কোরো না। আমিও তো হিন্দুর ছেলে। একজন হিন্দু ব্রাহ্মণ তোমাকে প্রত্যাখ্যান করলেও আর এক হিন্দু ভাই যে তোমাকে গ্রহন করতে চায়, তার বেলা ?

শবনমের মুখে এবার একটু হাসি ফুটল। বলল—চলো, চলে যাই। কাল রাত্রি থেকে কি যে হচ্ছে। কিছু বুঝতে পারছি না। আমার খুব খিদে পাচ্ছে। তোমারও পাচ্ছে নিশ্চয়ই ?

ওরা দুজনে ধীরে ধীরে বন পথ রেখা ধরে এগিয়ে চলল। বেশ কিছুদূর যাবার পর লোকজনের দেখা মিলল। এরা সব লাইন দিয়ে জঙ্গলের কাঠ কাটতে চলেছে। ওদের প্রত্যেকেরই মুখে গত রাতের ভয়াবহ ট্রেন দুর্ঘটনার কথা।

রঞ্জন ওদেরই একজনকে জিজ্ঞেস করল—আচ্ছা ভাই, এখানে কাছে পিঠে কোথাও কোন দোকান টোকান আছে ?

—হাঁ হাঁ। সিধা চলা যাইয়ে ! দুকান মিলেগা। সবজি মন্ডী মিলেগা। সব কুছ হ্যায় হুঁয়া পর।

ওরা আশান্বিত হয়ে সেই দিকেই এগিয়ে চলল।

খানিক যাবার পর দু'একটা করে ঘর বাড়ি চোখে পড়ল ওদের। অবশেষে ছোট্ট একটি বাজারের কাছে এসে পড়ল ওরা। একটি দোকানে গরন গরম কচুরি আর জিলিপি ভাজা হচ্ছিল। দোকানের বাইরে পেতে রাখা একটা নড়বড়ে বেঞ্চিতে এসে বসল দুজনে।

ওদের ভিজে পোষাক পরা চেহারার দিকে তাকিয়ে দোকানদার বলল—তুম দোনো কাঁহা সে আ রহে ভাই ?

রঞ্জন বলল—কাল রাত্রে যে ট্রেন দুর্ঘটনা হয়েছে আমরা তারই যাত্রী ছিলাম। এখন তোমাদের দেশে এসেছি। যে ভাবেই হোক আমাদের কলকাতায় ফিরে যাবার একটা পথ বলে দাও।

—ক্যায়সে যাওগে ? সব রাস্তা বন্‌ধ।

—তাহলে ?

—তাহলে কেয়া ? কুছ না কুছ হোগা। আভি বতাইয়ে ক্যা চাহিয়ে।

—আপাততঃ চারটে করে কচুরি আর একশো গ্রাম করে জিলিপি দাও। আমাদের কাছে টাকা পয়সা আছে। দাম দিতে পারব।

দোকানদার একটু জিভ কেটে বলল—হায় রাম। হাম এতনা বুঢ়া আদমী নেহী। তুমহারা পাশ পইসা নেহি রহনে সে ভি খিলায়গা তুমকো। আও, অন্দর চলা আও।

রঞ্জন বলল—কেন, বেশ তো বাইরে আছি।

—আরে খোকাবাবু ! ও তো স্রেফ দেহাতি লোগোকে লিয়ে। তুম্‌ দোনো অন্দরমে আ যাও।

—কিন্তু আমি হিন্দু আর ও মুসলমান। ভেতরে ঢুকলে দোকানের জাত যাবে না তো ?

দোকানদার ফিক করে একটু হেসে বলল—নেহি। হোটেল রেস্টুরেন্ট মে হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান সবকো একই নজর সে দেখা যাতি হ্যায়। তুম ডরো মাৎ।

ওরা দুজনে দোকানের ভেতরে ঢুকে পেট ভরে কচুরি আর জিলিপি খেল।

শবনম বলল—আমি চা খাব না। তুমি খাও তো খেতে পারো।

রঞ্জন নিজের জন্য একটা চা বলল।

চা খেতে খেতে রঞ্জন দোকানদারকে বলল—ভাই সাব, হিঁয়া ঠারনেকে লিয়ে হোটেল মিলেগা ?

—নেহি ভাই। লেকিন একঠো ধরমশালা হ্যায় নদীকা কিনারা মে। হুঁয়া চলা যাও।

ওরা দুজনে খাবারের দাম মিটিয়ে বাইরে এসে বাজারের কাছে

একটি দোকান থেকে দু'জোড়া চটি ও শবনমের জন্য একটা স্কার্ট কিনে ধর্মশালার দিকে চলল। ধর্মশালাটি যদিও মাড়োয়াড়ীর তবুও দেখাশোনার জন্য একজন বাঙালি ভদ্রলোক ছিলেন। রঞ্জনের মুখে সব শুনে বললেন—ঘর আমাদের আছে। কিন্তু শত বিপদেও এই ধর্মশালায় কোন মুসলমানকে ঘর দেবার হুকুম নেই।

রঞ্জন বলল—তাহলে আমরা কোথায় যাবো ?

—তা তো বলতে পারব না। শুধু এইটুকু বলতে পারি এই ধর্মশালায় তোমাদের স্থান হচ্ছে না।

রঞ্জন আর এক মুহূর্ত রইল না সেখানে। শবনমের হাত ধরে চলে এলো সেখান থেকে। তারপর নদীর ধারে পাথরের একটি খাঁজের কাছে এসে বলল—তুমি একটু আড়ালে গিয়ে পোষাকটা পাল্টে নাও শবনম। আর সভ্যতার আলোয় নয়, দেবস্থানে ধর্মশালাতেও নয়, চলো আমরা জঙ্গলে যাই। সেখানে কোন অরণ্যবাসীর গৃহে আশ্রয় নেবো, নয়তো গাছের ডালে বসে রাত কাটাব। যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে আমার।

—বাড়িতে ফোন করার তাহলে কি হবে ?

—সে ব্যাপারে তোমার কোন চিন্তা নেই। ওটা আমার ওপর ছেড়ে দাও। আগে একটা থাকার জায়গা ঠিক করি। তারপর সব কিছুর ব্যবস্থা করব।

ওরা ধীরে ধীরে জঙ্গলমুখো হল।

গভীর জঙ্গলে ঢোকার মুখে আবার পড়ল সেই নদীটা। তবে এখানে নদী পারাপারের জন্য একটা শক্ত মোটা গাছের গুঁড়ি রাখা আছে। তার মানে এখান দিয়ে লোকজন যাওয়া আসা করে। ওরা খুব সাবধানে সেই গুঁড়ির ওপর পা রেখে নদী পার হল। ছোট্ট নদী। বড় বড় পাথরের ওপর পা দিয়েও পারাপার হওয়া যায়।

নদী পার হয়ে কিছু দূরে যাবার পরই এক জায়গায় পাহাড়ের

গায়ে একটি গুহা দেখতে পেল। ওরা আশান্বিত হয়ে সেই গুহার কাছে এসে থমকে দাঁড়াল।

রঞ্জন বলল—এই আমাদের উপযুক্ত জায়গা। এখানে কেউ আমাদের জাত জানতে চাইবে না। কেউ বিরক্ত করবে না খুব শান্তিতে থাকতে পারব আমরা।

শবনম বলল—তা না হয় হল। কিন্তু রাত্তিরে যদি বাঘ ভালুক এসে ঢোকে?

রঞ্জন বলল—সে ব্যবস্থাও করব বৈকি। জঙ্গলে গাছের ডাল ভেঙে এনে পাথর সাজিয়ে মুখটাকে ছোট করে দেবো। দিব্যি আরামে থাকব আমরা। দ' একদিন থাকলেই যথেষ্ট। রাস্তা খুলে যাবে। এখন এখানটা পরিষ্কার করে চলো একটু বেলায় স্নান করে আবার শহরে যাই। সেখানে খেয়ে দেয়ে সন্ধ্যের আগেই এখানে ফিরে আসব।

শবনম খুশি মনে রঞ্জনের হাত ধরে গুহায় ঢুকল।

দুই

গুহার ভেতরটা খুবই অপরিষ্কার। দু'একটি শূন্য বোতল বা বিড়ির টুকরোও পাওয়া গেল সেখানে। তার মানে এখানে কেউ আসে। ওরা বেশ ভালো ভাবে গুহার ভেতরটা খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। খুব যে একটা বড় সড় গুহা তা নয়। তবে দু'দশজন লোক অনায়াসে দিনের পর দিন থাকতে পারে এখানে।

শবনম বলল—চমৎকার জায়গা। এই গভীর জঙ্গলে গুহার আশ্রয়ের কাছে ধর্মশালার ঐ ঘর কোথায় লাগে। এখন এসো সর্বাগ্রে দুজনে মিলে এর ভেতরটা পরিষ্কার করে ফেলি।

রঞ্জন তক্ষুনি গুহার বাইরে গিয়ে কয়েকটি আগাছা উপড়ে এনে ঝাঁট দিতে সুরু করল। সে কাজে শবনমও হাত লাগাল বৈকি। তারপরে দুজনে ঘাস পাতা ইত্যাদি নিয়ে এসে মেঝের পাথরের ওপর বিছালো। কেননা একেবারে কঠিন পাষাণের বুকে তো শোয়া যায় না।

এরপর দুজনে আশপাশ ঘুরে হঠাৎ এক জায়গায় ছোট্ট একটি ঝর্ণা আবিষ্কার করল।

রঞ্জন উল্লসিত হয়ে উঠল ঝর্ণা দেখে। বলল—এখানে স্নান এবং খাবার জলের সমস্যাটা মিটে গেল।

শবনম বলল—তাই তো। দাঁড়াও, কিছুটা জল ঐ শূন্য বোতল গুলোয় ভরে রাখি। বলে গুহার ভেতর থেকে দুটি বোতল এনে জল ভরল। তারপর সেগুলো রেখে এসে বলল—একটু স্নান করতে পারলে শরীরটা ঝরঝরে হোত। কিন্তু গা মুছব কিসে?

রঞ্জন বলল—একটু পরেই তো আমরা খেতে যাবো। অমনি

দুটো গামছা কিনে আনব। আর এই ঘাস পাতায় বিছোবার জন্যে একটা সতরঞ্জি।

শবনম বলল—সেই সঙ্গে দেশলাই মোমবাতি সম্ভব হলে একটা কেরোসিনের কুপি অথবা হ্যারিকেনও নেওয়া যেতে পারে। টর্চতো আছেই সঙ্গে।

—আর তার সঙ্গে রাতের খাবার।

—ঠিক বলেছ।

—শুধু তাই নয়, কালকের জন্যেও কিছু দোকান বাজার করে আনব। সম্ভব হলে এই জঙ্গলেই পিকনিকের মতো নিজেরা রেঁধে খাবো আমরা।

—দি আইডিয়া।

—তারপর বেলাবেলি ফিরে এসে গুহার মুখটাকে বন্ধ করবার চেষ্টা করব। করতেই হবে। না হলে নির্ঘাৎ বাঘের পেটে যাবো। কাছেই যখন ঝর্ণা, তমন বুনো জন্তুর দল ওখানে জল খেতে আসবেই। সেই সময় মানুষের গন্ধ পেয়ে যদি কেউ ঢোকে তো ব্যস। কেল্লা ফতে করে ছেড়ে দেবে।

ওরা আবার বনভূমির পথ ধরে নদী পার হয়ে এপারে এলো। তারপর প্রথমেই ওরা নিকটবর্তী পোষ্ট অফিসে গিয়ে ট্রাংককল করল শবনমের বাড়িতে।

শবনমের চাচাজী বললেন, এই মাত্র রিডিওয় সংবাদটা শুনেছেন তিনি। শবনমকে একটু সাবধানে থাকতে বললেন, ডেডবডি আনার ব্যাপারে ঝামেলা অনেক। কেননা এখন তিনি ইচ্ছে করলেও ঘটনাস্থলে যেতে পারবেন না। তবে যদি কোন উপায়ে কিছু করা সম্ভব হয় তো তিনি তা করবেনই।

রিসিভার নামিয়ে রেখে শবনম ছলছল চোখে রঞ্জনের দিকে তাকিয়ে বলল—এখন আমার জীবনে একমাত্র তুমি ছাড়া আর কেউ নেই রঞ্জন।

রঞ্জন ওর কাঁধে হাত রেখে বলল—সবই ঈশ্বরের ইচ্ছা। আল্লার মর্জি।

এই পোষ্ট অফিস থেকেই রঞ্জন ওর বাড়িতে এবং দিদির বাড়ি সম্বলপুরে দুটো টেলিগ্রাম করে ওর কুশলবার্তা জানিয়ে দিল।

এইটাই আমাদের উপযুক্ত জায়গা···পৃঃ – ৩০

এবার প্রয়োজনীয় জিনিস পত্তর যা যা দরকার সব কিছু একটা ঝোলা ব্যাগ কিনে তাইতে রাখল। তারপর দুপুরের খাওয়া সেরে

ফেরার সময় একটা বেশ ধারালো কাটারিও কিনল রঞ্জন।

শবনম অবাক হয়ে বলল—এটা দিয়ে তুমি কি করবে?

—এটা আমাদের আত্মরক্ষার হাতিয়ার। তাছাড়া বনের কাঠ কাটতে এরকম একটা কিছুর তো খুবই দরকার। তাই নিলাম।

ওরা যেন একটা নতুন পরিবেশে থাকবার আনন্দে বিভোর হয়ে সেই গুহার দিকে এগিয়ে চলল।

এই অল্প সময়ের মধ্যেই শবনম নিজের মনকে খুব শক্ত করে বেঁধে নিল। আব্বাজানের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই ওর সমস্ত স্নেহ মমতা এবং মায়াবন্ধনের দরজা রুদ্ধ হয়েছে। এখন ওর মনে হচ্ছে আর শহরে নয়, এই ঘন অরণ্যের বুকে গুহাবাসী হয়ে ওর এই কিশোর সঙ্গীটিকে নিয়ে দিনের পর দিন কাটাতে হয় তাতেও সে রাজি! চাচা চাচির নিষ্ঠুরতার বলি সে হতে চায় না। অবশ্য আল্লার দোয়ায় এমনিতেই কারো মুখাপেক্ষি তাকে হতে হবে না। আব্বাজান যা রেখে গেছেন ওর জন্যে তাতে সারা জীবন কোন কিছু না করলেও খাবার অভাব হবে না ওর। কিন্তু মনে মনে স্বপ্ন দেখলেও বরাবরের জন্য তো এই অরণ্যবাস সম্ভব নয়। শবনম তার সব কিছু হারালেও রঞ্জনের তো সবাই আছে। ঘরের ছেলে ও ঘরে তো ফিরতেই হবে ওকে।

যাই হোক। কিছু সময়ের মধ্যেই জঙ্গলের গভীরে সেই গুহার কাছে চলে এলো ওরা।

গুহার ভেতরটা অন্ধকার। ছোট্ট একটা চিমনি জেবলে সেই অন্ধকারে ক্ষীণ আলোর ব্যবস্থা করা হ'ল। শবনম রঞ্জনের কাঁধ থেকে ঝোলা ব্যাগটা নিয়ে একপাশে রেখে পুরু করে পেতে রাখা সেই ঘাস পাতার ওপর শতরঞ্জিটা বিছিয়ে টান হয়ে শুয়ে পড়ল একবার।

রঞ্জন বলল—কি ব্যাপার! শরীর খারাপ করছে নাকি?

—না। বড় ক্লান্ত। ঘুম পাচ্ছে।

—ঠিক আছে। তুমি বিশ্রাম করো। আমি ততক্ষণে একটু চেষ্টা

করে দেখি কিভাবে এই গুহার মুখটাকে আটকানো যায়।

শবনম শুয়ে থেকেই বিদ্যুতের মতো ঝিলিক দিয়ে লাফিয়ে উঠল —ওঃ হো। এখন তো বিশ্রামের সময় নয়। তুমি একা কেন, এসো আমরা দুজনে মিলেই হাত লাগাই।

রঞ্জন বলল—এসো তবে।

প্রথমেই ওরা শুকনো কাঠকুটো যা কিছু পারল সব এনে জড় করল গুহার ভেতর। তারপর বয়ে আনা যায় এমন বড় বড় পাথর জড় করে গুহার মুখটাকে সংকীর্ণ করে ফেলল। এবার জঙ্গলের শক্ত মোটা গাছের ডাল এনে সেগুলো গুহামুখে আটকে এমন একটা ঘর সৃষ্টি করল যে একমাত্র সাপ আর ইঁদুর ছাড়া কারো সাধ্য নেই এর ভেতরে ঢোকে।

দুজনের অক্লান্ত পরিশ্রমে সন্ধ্যের মধ্যেই হয়ে গেল সব কিছু। এবার গুহার ভেতরে বসে দীর্ঘ-রাত্রির অবসানের প্রতীক্ষা করা।

চিমনি লন্ঠনের আলোটা উস্কে দিয়ে ওরা নিজেদের জিনিসগুলো গোছগাছ করতে লাগল।

রাতের খাবারের ব্যবস্থা করেই এনেছে ওরা। পাঁউরুটি কলা বিস্কুট মিষ্টি সব কিছুই আছে। খাবারের জন্য জলও আছে দু'বোতল ভর্তি।

গুহার দেওয়ালে ঠেস দিয়ে শবনম পা দুটো লম্বালম্বি ভাবে ছড়িয়ে উদাস হয়ে বসে রইল। রঞ্জনও ঠিক ঐ একইভাবে বসে রইল ক্লান্ত দেহ নিয়ে। দুই শহরবাসী কিশোর কিশোরীর দৈব দুর্ঘটনায় এই অরণ্যবাস অভূতপূর্ব।

রঞ্জন বলল—তুমি নিয়তি মানো শবনম?

মানি বৈকি।

– একদিন আগেও আমরা কেউ কাউকে চিনতাম না।

– এখন তো চিনেছি।

– তোমার ভয় করছে না তো?

উঁহু। ভয় করবে কেন? আসলে আমাদের জীবনে ঐ ভয়াবহ দুর্ঘটনা না ঘটলে এই বিচিত্র অভিজ্ঞতা কি হোত আমাদের? এই ঘন অরণ্যের গভীরে একটি গুহার ভেতরে পরম নিশ্চিন্তে এইভাবে বসে থাকা কি কখনো সম্ভব হোত?

—না। তা অবশ্য হোত না।

—এই উদাহরণ তোমার কাছে কেমন লাগছে রঞ্জন?

—অপূর্ব। আমার কি মনে হচ্ছে জানো?

—কি মনে হচ্ছে?

—মনে হচ্ছে আমার কোন অতীত বলে কখনো কিছু ছিল না মনে হচ্ছে আমি যেন প্রকৃতই এই গুহারই বাসিন্দা।

—আশ্চর্য! ঠিক ঐ কথাই আমারও বার বার মনে হচ্ছে। আরো কি মনে হচ্ছে জানো?

—কি?

—মনে হচ্ছে এই গুহা ছেড়ে কখনো আর শহরের চার দেওয়ালের ঘরে যেন ফিরে না যাই। আমার তো সর্বস্ব গেছে। আর একাও থাকতে পারব না। তুমি যদি আমার সঙ্গে থাকতে রঞ্জন তাহলে সারা জীবন আমি এই জঙ্গলে গুহার ভেতরে কাটিয়ে দিতে পারতাম। প্রকৃতির বুকে এমন নীবিড় শান্তির স্বর্গ যে রচনা করা যায় তা এখানে না এলে অনুভবই করতে পারতাম না।

রঞ্জন কিছুক্ষণ কি যেন ভাবল। তারপর বলল—আচ্ছা শবনম, একটা কাজ করলে হয় না? আমরা যদি ইচ্ছে করেই কয়েকটা দিন এখানে থেকে যাই, তাহলে কেমন হয়?

শবনমের চোখ দুটো চকচকিয়ে উঠল।

রঞ্জন বলল—নতুন করে আবার কখনো আসা হয়তো হয়ে উঠবে না। কিন্তু এসে যখন পড়েছি, এই গুহার ভেতরে নিজেদের ঘর নিজেরাই যখন তৈরী করে নিয়েছি তখন থেকেই যাই না কিছুদিন।

শবনম বলল—আমি রাজি। যে বাড়িতে আমার আব্বাজান

নেই সে বাড়িতে ফিরতে আমার মন একটুও চাইছে না রঞ্জন। এখানে তবু তুমি আছো বলে বহু কষ্টে আমার বুকটাকে বেঁধেছি। কিন্তু কলকাতায় ফিরে গেলে আমি পাগল হয়ে যাবো।

রঞ্জন বলল—তবু ফিরতে তো হবেই।

—জানি। কিন্তু তাড়াতাড়ি নয়। তুমি আমার জীবন রক্ষা করেছ। আমার এত বড় বিপদে আমার পাশে আছো। নিজের স্বার্থ ত্যাগ করেও আমাকে নিয়ে এই গুহায় এসে কত কষ্ট করছ। এখন তুমিই আমার সব। তাই তুমি থাকলে আমি থাকব। তুমি গেলে আমাকেও যেতে হবে। একা তো এই বনের ভেতরে থাকা যায় না। তাই, যদি পারো তো কিছুদিন থেকেই যাও এখানে।

রঞ্জন হেসে বলল—থাকব। তাছাড়া সত্যি বলতে কি আমার কোন বোন বা বান্ধবী নেই। আর তোমার মতন এত ফর্সা এত স্মার্ট মেয়েও আমি কখনো দেখিনি। এই সারাদিনে তোমার ওপর আমার অনেক মায়া পড়ে গেছে। তুমি হয়তো বিশ্বাস করবে না শবনম, তোমাকে ছেড়ে যেতে আমার মন কেমন করবে।

শবনমের চোখ দুটি জলে ভরে এলো। বলল—সত্যি বলছ?

রঞ্জন ওর কাঁধের ওপর হাত রেখে বলল—তোমার গা ছুঁয়ে বলছি। তারপর বলল, আমি এখনো স্কুলের গণ্ডী অতিক্রম করিনি। সামনের বছর ফাইন্যাল দেবো। আমি যদি বড় হতাম নিজের পায়ে দাঁড়াতাম তাহলে তোমার সব দায়িত্ব আমি নিয়ে নিতাম। হিন্দু মুসলমানের কোন ভেদাভেদ আমার মধ্যে নেই। কিন্তু আমার মা-বাবা আছেন। তাঁরা কি ভাবে নেবেন তোমাকে? তুমি যদি মুসলমান না হতে তাহলে তোমাকে আর পার্ল স্ট্রীটের বাড়িতে তোমার চাচা-চাচির সঙ্গে থাকতে যেতে হোত না। আমি ঠিক তোমাকে নিয়ে হাজির হতাম আমাদের বাড়িতে। এখন থেকে তুমি আমার কাছেই থাকতে পারতে। কিন্তু তা যে হবার নয়। আমি সংস্কার মুক্ত হলেও তাঁরা হবেন কেন?

উঁহু। ভয় করবে কেন? আসলে আমাদের জীবনে ঐ ভয়াবহ দুর্ঘটনা না ঘটলে এই বিচিত্র অভিজ্ঞতা কি হোত আমাদের? এই ঘন অরণ্যের গভীরে একটি গুহার ভেতরে পরম নিশ্চিন্তে এইভাবে বসে থাকা কি কখনো সম্ভব হোত?

—না। তা অবশ্য হোত না।

—এই উদাহরণ তোমার কাছে কেমন লাগছে রঞ্জন?

—অপূর্ব। আমার কি মনে হচ্ছে জানো?

—কি মনে হচ্ছে?

—মনে হচ্ছে আমার কোন অতীত বলে কখনো কিছু ছিল না মনে হচ্ছে আমি যেন প্রকৃতই এই গুহারই বাসিন্দা।

—আশ্চর্য! ঠিক ঐ কথাই আমারও বার বার মনে হচ্ছে। আরো কি মনে হচ্ছে জানো?

—কি?

—মনে হচ্ছে এই গুহা ছেড়ে কখনো আর শহরের চার দেওয়ালের ঘরে যেন ফিরে না যাই। আমার তো সর্বস্ব গেছে। আর একাও থাকতে পারব না। তুমি যদি আমার সঙ্গে থাকতে রঞ্জন তাহলে সারা জীবন আমি এই জঙ্গলে গুহার ভেতরে কাটিয়ে দিতে পারতাম। প্রকৃতির বুকে এমন নীবিড় শান্তির স্বর্গ যে রচনা করা যায় তা এখানে না এলে অনুভবই করতে পারতাম না।

রঞ্জন কিছুক্ষণ কি যেন ভাবল। তারপর বলল—আচ্ছা শবনম, একটা কাজ করলে হয় না? আমরা যদি ইচ্ছে করেই কয়েকটা দিন এখানে থেকে যাই, তাহলে কেমন হয়?

শবনমের চোখ দুটো চকচকিয়ে উঠল।

রঞ্জন বলল—নতুন করে আবার কখনো আসা হয়তো হয়ে উঠবে না। কিন্তু এসে যখন পড়েছি, এই গুহার ভেতরে নিজেদের ঘর নিজেরাই যখন তৈরী করে নিয়েছি তখন থেকেই যাই না কিছুদিন।

শবনম বলল—আমি রাজি। যে বাড়িতে আমার আব্বাজান

নেই সে বাড়িতে ফিরতে আমার মন একটুও চাইছে না রঞ্জন। এখানে তবু তুমি আছো বলে বহু কষ্টে আমার বুকটাকে বেঁধেছি। কিন্তু কলকাতায় ফিরে গেলে আমি পাগল হয়ে যাবো।

রঞ্জন বলল—তবু ফিরতে তো হবেই।

—জানি। কিন্তু তাড়াতাড়ি নয়। তুমি আমার জীবন রক্ষা করেছ। আমার এত বড় বিপদে আমার পাশে আছো। নিজের স্বার্থ ত্যাগ করেও আমাকে নিয়ে এই গুহায় এসে কত কষ্ট করছ। এখন তুমিই আমার সব। তাই তুমি থাকলে আমি থাকব। তুমি গেলে আমাকেও যেতে হবে। একা তো এই বনের ভেতরে থাকা যায় না। তাই, যদি পারো তো কিছুদিন থেকেই যাও এখানে।

রঞ্জন হেসে বলল—থাকব। তাছাড়া সত্যি বলতে কি আমার কোন বোন বা বান্ধবী নেই। আর তোমার মতন এত ফর্সা এত স্মার্ট মেয়েও আমি কখনো দেখিনি। এই সারাদিনে তোমার ওপর আমার অনেক মায়া পড়ে গেছে। তুমি হয়তো বিশ্বাস করবে না শবনম, তোমাকে ছেড়ে যেতে আমার মন কেমন করবে।

শবনমের চোখ দুটি জলে ভরে এলো। বলল—সত্যি বলছ?

রঞ্জন ওর কাঁধের ওপর হাত রেখে বলল—তোমার গা ছুঁয়ে বলছি। তারপর বলল, আমি এখনো স্কুলের গণ্ডী অতিক্রম করিনি। সামনের বছর ফাইন্যাল দেবো। আমি যদি বড় হতাম নিজের পায়ে দাঁড়াতাম তাহলে তোমার সব দায়িত্ব আমি নিয়ে নিতাম। হিন্দু মুসলমানের কোন ভেদাভেদ আমার মধ্যে নেই। কিন্তু আমার মা-বাবা আছেন। তাঁরা কি ভাবে নেবেন তোমাকে? তুমি যদি মুসলমান না হতে তাহলে তোমাকে আর পার্ল ষ্ট্রীটের বাড়িতে তোমার চাচা-চাচির সঙ্গে থাকতে যেতে হোত না। আমি ঠিক তোমাকে নিয়ে হাজির হতাম আমাদের বাড়িতে। এখন থেকে তুমি আমার কাছেই থাকতে পারতে। কিন্তু তা যে হবার নয়। আমি সংস্কার মুক্ত হলেও তাঁরা হবেন কেন?

শবনম রঞ্জনের একটি হাত স্নেহভরে ওর বুকে নিয়ে বলল—আচ্ছা রঞ্জন, আমি যদি হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করে হিন্দু হয়ে যাই? তাহলে কি তোমার মা-বাবা পারবেন না আমাকে তোমার কাছে থাকতে দিতে?

রঞ্জন বলল—কিন্তু আমাদের ধর্মের যে গোঁড়ামি অনেক। হিন্দু থেকে মুসলমান হওয়া যায় কিন্তু মুসলমান থেকে হিন্দু হওয়া যায় কিনা আমি জানি না।

কথায় কথায় অনেক রাত হয়ে গেল। দুজনে রাতের খাওয়া সেরে আলো নিভিয়ে সেই গদীর মতো তৃণশয্যায় পবিত্রতা বজায় রেখে শুয়ে পড়ল চুপচাপ।

রাত তখন কত তা কে জানে? শবনমের ঠ্যালা পেয়ে ঘুম ভাঙল রঞ্জনের। আর ঘুম ভাঙতেই শুনতে পেল বাইরে ঘোড়ার খুরের শব্দ। মশালের আলোর আভাও সংকীর্ণ গুহামুখ দিয়ে ফুটে উঠল।

রঞ্জন বলল—নিশ্চয়ই কোন দুস্কৃতীর দল এসে জুটেছে এখানে।

—আমার ভয় করছে রঞ্জন।

রঞ্জনের মুখও ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। বোকার মতো এখানে আশ্রয় নেওয়াটা খুবই কাঁচা কাজ হয়েছে। চোর ডাকাত প্রভৃতি দুস্কৃতকারীদের আড্ডার জায়গাই হ'ল এই সব পরিত্যক্ত গুহা। এখন ওরা যদি ওদের ঘাঁটি দখল করতে আসে? তাহলে সমূহ বিপদ। রঞ্জন নিজের জন্য চিন্তা করছে না। ভয় ওর শবনমকে নিয়ে। ওর সুন্দর মুখশ্রী এবং গায়ের রঙ সবার দৃষ্টি কেড়ে নেয়। এখন ওরা এই রাতে যদি গুহা দখল করে তাহলে শবনমকে রক্ষা করা দুষ্কর হয়ে পড়বে ওর পক্ষে।

শবনম ভয়ে ভয়ে বলল—কি হবে রঞ্জন?

রঞ্জন কি উত্তর দেবে ভেবে পেল না। বলল—ভেঙে পড়ো না।

দেখাই যাক না ওরা কি করে। তুমি এক কাজ করো, গুহামুখের দেওয়ালের কোণে একেবারে লেপটে থাকো। যদি ওরা ঢোকে তাহলে আমিই আগে মোকাবিলা করব ওদের। বলেই ঘাস পাতার বিছানা থেকে শতরঞ্জিটা তুলে ওর হাতে দিয়ে বলল—তুমি এটা মুড়ি দিয়ে লুকিয়ে থাকো। যাও।

—তুমি ?

—আমি এখানেই থাকব। এমন ভান দেখাবো যেন আমায় জোর করে কেউ এখানে আটকে রেখে গেছে।

রঞ্জনের কথামতো তাই করল শবনম। শতরঞ্জিটা সর্বাঙ্গে মুড়ি দিয়ে গুহামুখের একপাশে অন্ধকার কোণে লুকিয়ে রইল।

একটু পরেই ওরা যা আশংকা করেছিল তাই হ'ল। বাইরে থেকে গম্ভীর গলায় একটা হাঁক শোনা গেল—অন্দরমে কৌন হ্যায় রে ? জলদি বাহার নিকালো।

রঞ্জন কোন সাড়া শব্দ না দিয়ে চুপ চাপ বসে রইল।

ওদিক থেকে তখন কাঠের আটকান ভেঙে ফেলার কাজ সুরু হয়েছে।

রঞ্জনও এক পা দু'পা করে পিছু হটতে লাগল। আর পথ নেই। দেয়ালের শেষ প্রান্তে ঠেস দিয়ে চুপ চাপ দাঁড়িয়ে রইল সে। কাটারিটা এই অন্ধকারে কোথায় রয়েছে কে জানে ? সঙ্গে থাকলে ভালো হোত। কেউ আক্রমণ করলে সমুচিত শিক্ষা দিত তাকে।

কাঠের আগল ভেঙে দু'এক ধাপ পাথর সরাতেই একজন লোকের গলে ঢোকার মতো পথ হয়ে গেল।

রঞ্জন সবিস্ময়ে দেখল মাথায় পাগড়ি অর্ধেক মুখ কাপড় ঢাকা বন্দুকধারী একজন ভেতরে ঢোকার জন্য মাথা গলাল। শরীরের অর্ধেক ঢুকেছে কি না ঢুকেছে হঠাৎ দেখা গেল মাথাটি তার খসে পড়ল ধড় থেকে। রঞ্জন শিউরে উঠল। একি করল শবনম ! এমন কাঁচা কাজ কেউ করে ? বাইরে ওরা কতজন আছে না আছে

তা কে জানে ? যদি ওরা টের পায় ? রঞ্জন ছুটে এসে লোকটার হাত দুটো ধরে হিড় হিড় করে টানতেই পুরো দেহটা ভেতরে চলে এলো। কয়েকটি পাথরও ধ্বসে পড়ল দুড় দাড় করে। তারপর দেহটা এক ধারে সরিয়ে রেখে বন্দুকটা ছিনিয়ে নিল সর্বাগ্রে।

শবনম বলল – তুমি বন্দুক ছুঁড়তে পারো ?

—না।

—তাহলে ওটা নিয়ে কি করবে ?

—ওদের ভয় দেখাব।

শবনম হেসে বলল – তাহলেই হয়েছে। দাও ওটা আমাকে দাও। আর বন্দুক চালানো কাকে বলে চেয়ে দেখো।

—তুমি পারো রাইফেল শুটিং করতে ?

—পারি বলেই তো মুন্ডুটা ওর নামিয়ে দিলাম।

—কিন্তু মোচাকে ঢিল ছুঁড়লে তো ?

—তা ছুঁড়লাম। যাক, তুমি কি কাটারিটা নেবে ?

—নেবো ! আমি ভেবেই পাচ্ছি না কোন ফাঁকে কাটারিটা তুমি নিলে।

বাইরে থেকে তখন হাঁক ডাক শোনা যাচ্ছে - আরে এ শম্ভু ভেইয়া। কা ভৈল ?

খানিক বাদেই মস মস জুতোর শব্দ। এ লোকটিও আগের লোকটির মতো মাথা গলাতেই রঞ্জনের কাটারির ঘা পড়ল তার ঘাড়ের ওপর। অনভ্যস্ত হাত। তাই এক কোপে বিচ্ছিন্ন হ'ল না। লোকটি যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠল।

রঞ্জন ঐ অবস্থাতেই লোকটিকে ঢোকাল ভেতরে। সেই যন্ত্রণার দৃশ্য চোখে দেখা যায় না। শবনম একটুও দেরি না করে ওর বুকের বাঁদিকে একটা গুলি করল।

বাইরে থেকে একজনকে বলতে শোনা গেল – আরে বাঃ। এ যাদু গুম্ফা হো গিয়া ক্যা। যো অন্দর মে ঘুসতা ও বাহার নেহি

নিকাল তা।

আর একজন কে বলল—চোপ রহো বুরবাক কাঁহাকা। অন্দরমে গোলি কা শব্দ শুনা ?

আর একজন বলল—হাঁ হাঁ শুনা। আভি চলো, ভাগো হিঁয়াসে। জরুর কুছ গড়বড় হো গিয়া হোগা।

কিন্তু ভাগবে কি ? গুহার ভেতর থেকে শবনমের বন্দুক তখন গর্জে উঠেছে 'ডিস্যুম, ডিস্যুম'।

দু'দুটো তাজা প্রাণ লুটিয়ে পড়ল মাটির বুকে। ঘোড়াগুলো চিঁ হি-হি-হি শব্দ করে ঊর্ধ পদ হয়ে লাফিয়ে উঠল একবার। কয়েকজন অশ্বারোহীর পলায়নের শব্দও শোনা গেল।

শবনমের কীর্তি দেখে রঞ্জন স্তব্ধ হয়ে গেল। এমন সুন্দর কান্তি যার, যার মুখের দিকে তাকালে স্বর্গের সুষমা অনুভব করা যায়, তার হাতে এমন মৃত্যু মাদল কি করে বেজে উঠল ? তাই ভয়ে ভয়ে বলল—এবার আমরা কি করব ?

শবনমের চেহারাটাই তখন অন্যরকম হয়ে গেছে। কী দারুণ তেজ ওর শরীরে। কে বলবে ও একটি সদ্য পিতৃহারা কিশোরী মেয়ে। ওর দিকে চোখ মেলে তাকাতেও এখন ভয় করল রঞ্জনের।

শবনম একটু স্বাভাবিক হয়ে বলল—এই মুহূর্তে আমাদের করণীয় কিছু নেই যদিও, তবুও আমাদের সতর্ক থাকতে হবে।

—এই ডেড বডি দুটোর কি হবে ?

—দুটো তো ভেতরে। বাইরে আরো দুটো আছে। এখন এই রাতে যে যেখানে আছে সে সেখানেই থাকুক।

—কিন্তু ওরা যদি একটু পরে দলবল নিয়ে আবার ফিরে আসে ?

শবনম একটু চিন্তা করে বলল—তোমার ধারণাটা অবশ্য অমূলক নয়। এবং তা যদি হয় তাহলে সকাল পর্যন্ত যুদ্ধ চলবে। আর সেই যুদ্ধে মরবে ওরাই। আমাদের গায়ে আঁচড়টিও লাগবে না।

—কেন ?

—আমরা গুহার ভেতর থেকে পাথরের খাঁজ দিয়ে ওদের লক্ষ্য করতে পারব। কিন্তু ওরা বাইরে থেকে তা পারবে না। কোন রকমে রাত্রিটা কাটাতে পারলে দিনের আলোয় পালাবে ওরা। আমরাও তখন বেরোতে পারব।

—কিন্তু সারারাত লড়াই করার মতো গুলি কি দুটো বন্দুকে আছে?

—বন্দুকে না থাকলেও ওদের কাছে আছে। তাছাড়া বাইরে যে দুজন ঘুমিয়ে আছে তাদের কাছ থেকেও নিয়ে আসতে হবে বন্দুক দুটো।

রঞ্জন ভয় পেয়ে বলল—না না। বাইরে যাবার দরকার নেই। এই দুটোতেই কাজ চলুক।

শবনম বলল—ও দুটো আনতেই হবে রঞ্জন। লড়াই যখন শুরু করেছি তখন শেষ না হওয়া পর্যন্ত চালিয়ে যাবো।

—তাহলে নিয়েই আসি ও দুটো?

—উঁহু। তুমি নয়, আমি।

—কেন আমিই যাই না?

—তুমি ভয় পেয়েছ রঞ্জন। তাছাড়া যদি কোন বিপদ আসে সেটা আমার ওপর দিয়েই আসুক। বিপদ এলে বন্দুক নিয়ে আমি লড়তে পারব। তুমি পারবে না।

শবনম বেরোতে যাচ্ছে, রঞ্জন ওর একটি হাত ধরে টান দিল। বলল—তার চেয়ে বলি কি এখুনি এই গুহা ছেড়ে আমরা কোথাও পালিয়ে যাই চলো।

—কোথায় যাবো? এই জঙ্গলে রাত দুপুরে চিতার পেটে যাবো যে। এখান থেকে সকালের আগে কোথাও যাওয়া সম্ভব নয়। হাত ছাড়ো।

শবনম বন্দুক নিয়ে সেই সংকীর্ণ গুহামুখে পাথরের আটকানের ফাঁক দিয়ে বাইরে গেল।

রঞ্জন ভেতর থেকেই দেখতে পেল, চারপাশ একবার ভালোভাবে দেখে নিয়ে ডাকাতদের মশালের আলোয় কি দ্রুত গতিতে কাজ সারল শবনম। চটপট বন্দুকগুলো কেড়ে নিয়েই রঞ্জনের দিকে এগিয়ে দিল। তারপর ওদের পকেট হাতড়ে দোনলা রিভলভার

দু'দুটো তাজা প্রাণ লুটিয়ে পড়ল মাটির বুকে·· পৃঃ ৪১

বার করল দুটো। সেই সঙ্গে কয়েকটি কার্তুজ। আর তারপরই যা করল তা একেবারে অভাবনীয়। সেই লোকদুটোর একজনের

পোষাক পরে মাথায় ফেট্টি বেঁধে মেলিটারী মেজাজে আবার গুহার ভেতরে এসে ঢুকল। ওদের ফেলে যাওয়া মশালও একটা নিয়ে আসতে ভুলল না।

ওর ঐ রণচণ্ডীমূর্তি দেখে রঞ্জন ভয় পেয়ে গেল খুব। বলল—না না। এই পোষাকে তোমাকে মানায় না।

শবনম ঘর কাঁপিয়ে হেসে উঠল হো হো করে। বলল—তুমি ভয় পেয়েছ রঞ্জন ?

—হ্যাঁ হ্যাঁ পেয়েছি। সত্যিই ভয় পেয়েছি আমি। মায়ের মুখে দশমহাবিদ্যার গল্প শুনেছিলাম। সতী পিতৃগৃহে যাবার জন্যে শিবকে যে রূপ দেখিয়েছিলেন তোমার মধ্যেও আমি এই গুহার ভেতরে সেই রূপ দেখতে পাচ্ছি। তুমিই সেই ছিন্নমস্তা, বগলা, ধূমাবতী। তুমিই সব। না না শবনম, আবার তুমি আগের মতো হয়ে যাও। তোমাকে দেখে আমার বুকের ভেতরে কিরকম যেন হচ্ছে।

—আমারও। বলে রঞ্জনের কাঁধে একটা হাত রেখে শবনম বলল—আমারও তাই মনে হচ্ছে। আমি বুঝতে পারছি হঠাৎ কি করে যেন আমি বদলে গেছি। আসলে এই বন্দুকের নলে আমি যেন মহাশক্তির উৎস খুঁজে পেয়েছি। নাহলে এই বন্দুক হাতে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অমন ভয়ংকর দস্যুদের চার-চারজন প্রাণ হারাল কি করে ? আসলে কোন এক অদৃশ্য শক্তি আমাকে দিয়ে কোন কাজ করাতে চায়। নাহলে এ রকম দুর্ঘটনাই বা ঘটবে কেন আর আমরাই বা এখানে আসব কেন ? আমি আমার পথ খুঁজে পেয়েছি রঞ্জন। এই বন্দুকের নল দিয়েই আমি আমার আব্বাজানের মৃত্যুর জন্য যারা দায়ী তাদের মৃত্যুর কোলে শুইয়ে দেবো।

রঞ্জন কাঁপা কাঁপা গলায় বলল—তুমি কি ফুলন দেবী হতে চাও ?

—হতে চাই কেন ? হয়েছি। এই পোষাক যখন পরেছি, এই বন্দুক ও রিভলভার যখন হাতে নিয়েছি তখন আর আমি এখান থেকে যাচ্ছি না। আমি খুঁজে বার করব এই দস্যুর দলকে। ওদের

সঙ্গে হাত মেলাব। তারপর তাদের অস্ত্রে তাদেরকেই এক এক করে সমুচিত শিক্ষা দেবো আমি।

—তারপর ?

—তারপর ! জঙ্গলের আরো গভীরে এই রকমই একটি পরিত্যক্ত গুহা বেছে নিয়ে সেখানে একাকি রাজত্ব করব। আমি নিজেও একটা দল গড়ে তুলব এখানে। অত্যাচারীর অত্যাচারের বিরুদ্ধে আমার বন্দুকের নল গর্জে উঠবে।

—পারবে তুমি নিরন্নের মুখে অন্ন দিতে ?

—পারব।

—এখানকার অনুন্নত সম্প্রদায়কে বহিরাগত শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করতে পারবে ?

—পারব।

—পারবে আরণ্যকদের অরণ্যের অধিকার ফিরিয়ে দিতে ?

—পারব।

—যদি না পারো ?

—এই রিভলভারের শেষ গুলিটি খরচা করব আমি আমার নিজের জন্য।

—এই তোমার শেষ কথা ?

—হ্যাঁ। এই আমার শেষ কথা। আমি মরে গেছি। এই বন্দুকের গুলির শব্দ আমার পুনর্জন্ম ঘোষণা করেছে।

—তোমাকে ভূতে পেয়েছে। তাই এত আবোল তাবোল বকছ।

—আমি আবোল তাবোল বকছি ? তাহলে এই যে প্রাণহীন দেহগুলো এখানে পড়ে আছে এগুলোও কি মিথ্যে ? আমি ফুলন দেবী নই রঞ্জন। এমন কি শবনমও নই। এখন আর আমার কোন জাত নেই। আমি নইকো হিন্দু, নই মুসলমান, নইকো বৌদ্ধ, জৈন, খ্রীস্টান।

—তাহলে তুমি কি ?

গুহামুখের সংকীর্ণ ফাঁকটুকুর ভেতর দিয়ে 'গুড়ুম গুড়ুম' শব্দে দুবার গুলি করে শবনম বলল—আজ থেকে আমি এই অরণ্যের দেবী। আমাকে অরণ্যদেবী বলতে পারো। লোকে ভয়ে ভক্তি করবে আমাকে। অবশ্যই দুষ্ট লোকে। ভালো লোকেদের সঙ্গে আমার ভালো সম্পর্ক থাকবে। খারাপ লোকেদের সঙ্গে সম্পর্ক হবে সাপ আর নেউলের। তাদের কাছে আমি হবো ভয়ংকরী। দেবী ভয়ংকরী হবে আমার নাম।

শবনমের দুটি চোখের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে কেমন যেন ঝিমঝিমিয়ে উঠল রঞ্জনের মাথাটা। তারপর হঠাৎই এক সময় জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়ল সে। অবশ্য মেঝেতে পড়ার আগেই শবনম তাকে ধরে ফেলল। তারপর ওকে শুইয়ে দিল ওদেরই সৃষ্ট সেই তৃণ-শয্যায়। ওর বুক থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো কান্নার মতো হয়ে। মুখে অস্ফুট উচ্চারণ করল, 'ছেলেমানুষ'।

খুব ভোরে যখন হুঁশ ফিরল বা ঘুম ভাঙল রঞ্জনের, তখন ধীরে ধীরে উঠে বসল সে। দেখল ওর পায়ের কাছে উপুর হয়ে শুয়ে আছে শবনম। এই নাকি অরণ্যদেবী! দেবী ভয়ংকরী। পাগলি আর কাকে বলে।

রঞ্জন উঠে দাঁড়িয়ে যেই না গুহার বাইরের অবস্থাটা দেখতে যাবার জন্য পা বাড়িয়েছে অমনি বাধা পেল। আরে! করছে কি মেয়েটা! ওর পায়ের সঙ্গে একটা দড়ি বেঁধে নিজের পায়ের সঙ্গে জড়িয়ে রেখেছে। সেই টান পেয়ে শবনমও উঠে বসল। বলল—কি ব্যাপার! একা একা কোথায় যাচ্ছো? আমাকে ফেলে রেখে পালাচ্ছ বুঝি?

—না না। তা কেন? আসলে কাল অনেক রাত অব্দি জেগে তুমি ঘুমচ্ছো তাই ডাকিনি।

শবনম হেসে বলল—দেখলে তো কেমন বুদ্ধি ? তুমি যে চুপি চুপি পালাবে সে উপায় রাখিনি।

রঞ্জন বলল—হ্যাঁ, বুদ্ধির তোমার প্রশংসা করি। কিন্তু বাইরে দুটো ভেতরে দুটো ডেডবডি রেখে তুমি যে এমন নিশ্চিন্তে নিদ্রা খাচ্ছিলে তা সেই সুযোগে যদি কোন বাঘ টাঘ এসে ঢুকত ?

—তা ঢুকতে পারত। তবে সারারাত জেগে ভোরের দিকেই একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম আমি। এখন চলো দেখি ঝর্ণার জলে গিয়ে মুখ হাতগুলো ধুয়ে আসি। সত্যি, যা গেল কাল।

ওরা গুহামুখের পাথর সরিয়ে পথ প্রশস্ত করে বাইরে এলো। দুটি ডেডবডির একটিও তখন বাইরে নেই। না থাক! ওরা ঘন অরণ্যানীর মধ্য দিয়ে সেই ঝর্ণার তলায় গিয়ে মুখ হাত ধুয়ে পরিষ্কার হ'ল।

শবনম বলল—এই সময় একটু চা টোস্ট পেলে কেমন হোত রঞ্জন ?

—মন্দ হোত না। কিন্তু ওসব যে খেতে যাবো সে উপায়ও তো রাখনি তুমি। যে পোষাক চড়িয়েছ অঙ্গে এই পোষাকে কি শহরে যাওয়া যায় ? মাথার ভূত যদি ছেড়ে গিয়ে থাকে তাহলে এখুনি পোষাকটা ছেড়ে আগের মতো ভালো হয়ে এসো। নাহলে এই পোষাক দেখলে নির্ঘাৎ পুলিশে ধরবে।

রঞ্জনের কথায় হোঃ হোঃ করে গগন ফাটিয়ে হেসে উঠল শবনম। বলল—ওটি হচ্ছে না। আমার আব্বাজান মিলিটারীর লোক ছিলেন। ঘোড়ায় চড়া থেকে কার ড্রাইভিং এবং বন্দুক চালানো থেকে পর্বতারোহণ সবই আব্বাজান আমাকে শিখিয়ে গেছেন। এই যন্ত্র হাতে যখন পেয়েছি তখন লড়ে যাবো একবার। যাও, মালপত্তর যা কিছু আছে আমাদের সব গুছিয়ে গাছিয়ে নিয়ে এসো।

রঞ্জন ইতঃস্তত করতে লাগল দেখে শবনম আবার বলল—যাও। চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকো না। ভয় নেই, নিজের স্বার্থের জন্য তোমার

জীবন নষ্ট করব না। তোমার দয়ায় এই প্রাণ আমি ফিরে পেয়েছি। আমার উপযুক্ত একটা জায়গা পেয়ে গেলেই আমি তোমাকে ছেড়ে দেবো। তুমি তোমার মা-বাবার কাছে ফিরে যাবে।

রঞ্জন একান্ত বাধ্য অনুগতর মতো আবার গুহার ভেতরে ঢুকে সব কিছু বার করে নিয়ে এলো। তারপর শবনমের নির্দেশ মতো বন পথ ধরে চলতে শুরু করল ওরা।

পাহাড়টা এবার ক্রমশ ঢালু হয়ে গভীরতর জঙ্গলের মধ্যে গিয়ে মিশেছে। সেই ঢালু পথে হঠাৎ একটি তেজস্বী ঘোড়াকে ঘাস খেতে দেখে আনন্দে লাফিয়ে উঠল শবনম। বলল—পেয়েছি। পেয়েছি।

—কি পেয়েছ ?

—আমার নতুন বন্ধুকে।

—ঘোড়াটা তোমার বন্ধু ?

—নিশ্চয়ই। কাল যারা ডাকাতি করতে এসেছিল এ তাদেরই ঘোড়া।

—কি করে বুঝলে ?

—দেখছ না ঘোড়ার পিঠে বসার জায়গায় জিন লাগানো আছে। বুনো ঘোড়া হলে এসব থাকত না। তাছাড়া বুনো ঘোড়ার চেহারায় এত চাকচিক্য থাকে না। এ বাইরের দেশের ঘোড়া। হয়তো অস্ট্রেলিয়ার।

রঞ্জন মনে মনে শবনমের বুদ্ধির প্রশংসা না করে পারল না।

শবনম ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল ঘোড়াটার কাছে। তারপর ওর লাগাম ধরে টান দিয়ে ওকে কাছে এনে এমন অদ্ভুত কায়দায় ওর ঘাড়ে গলায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল যে ঘোড়াটা একটুও ছটফট করল না বা বিরক্ত হ'ল না। বরং এক দৃষ্টে কিছুক্ষণ শবনমের দিকে চেয়ে থেকে ওর গা শুঁকতে লাগল।

এই সুযোগে শবনম চড়ে বসল ঘোড়ার পিঠে। ঘোড়াটা বাধা দিল না। বরং টান হয়ে গলা উঁচিয়ে আদেশের প্রতীক্ষা করল।

রঞ্জন অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল শবনমের দিকে। পুরুষের পোষাক পরা, মাথায় ফেট্টি বাঁধা কাঁধে বন্দুক আর এক হাতে রিভলভার ধরা এই মেয়েটি যে এক দস্যু নেত্রী নয় তা কে বলবে? ওকে দেখে ওর রীতিমতো ভয় করতে লাগল।

শবনম বলল—তুমিও এসে বসো না আমার পিছনে।

—আমি উঠতে পারব না। তাছাড়া সত্যি বলতে কি আমার খুব ভয় করছে। তাই বলি, তুমি বরং ঘোড়ায় চেপেই চলো। আমি হেঁটে যাই।

শবনম হেসে বলল—আমাকে দেখেও তোমার ভয় কাটছে না রঞ্জন। তুমি না ছেলে? এসো। উঠে এসো। হাত ধরো আমার। বলে একটা হাত বাড়িয়ে দিল শবনম।

রঞ্জন তবুও উঠল না। ঘোড়ার লাগাম ধরে হেঁটে হেঁটেই পথ চলল। শবনম ধীরে ধীরে অশ্বচালনা করল। পাহাড়ের সেই ঢালু পথ বেয়ে ঘোড়াটা ওদের দুজনকে পিঠে নিয়ে এগিয়ে চলল।

খানিকটা পথ যাবার পর এক জায়গায় ওরা 'ঠক ঠক' করে একটানা একটা শব্দ শুনতে পেল। শব্দটা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই ঘোড়ার রাশ টেনে ধরল শবনম। তারপর রঞ্জনকে নিয়ে নেমে পড়ল ঘোড়ার পিঠ থেকে। পাশেরই একটি গাছের গুঁড়ির সঙ্গে ঘোড়াটাকে বেঁধে ওরা সেই শব্দ শুনে এগিয়ে চলল। কিছু দূর যাবার পরই দেখতে পেল এক জায়গায় কিছু অনুন্নত শ্রেণীর পাহাড়িয়া লোকজন নির্মম কুঠারের আঘাতে বড় বড় গাছপালার ডাল কেটে ফাঁকা করে দিচ্ছে।

শবনম বাঘিনীর মতো হুংকার দিয়ে উঠল—হুঁশিয়ার।

সবাই চুপ। ঠুক ঠাক শব্দ স্তব্ধ হয়ে গেল। সকলেরই চোখে মুখে বিস্ময়, এ আবার কেরে বাবা!

শবনম বলল—এ তোমরা কি করছ?

—আমরা গরীব মানুষ মা। দুটি ভাত রুটির জন্য গাছ কাটছি।

কার হুকুমে ?

—আজ্ঞে শেঠ মংঘীরামজীর হুকুমে।

—কত টাকা পাও তোমরা ?

—গাছ প্রতি বিশ টাকা।

শবনম গম্ভীর মেজাজে এদিক থেকে সেদিকে পায়চারি করতে করতে বলল—মাত্র বিশ টাকা! তোমরা কি জান এই পাহাড়ে এমন গাছও আছে যার দাম বিশ হাজার টাকা থেকে লাখ টাকা পর্যন্ত।

—না মা।

—তোমরা কোথায় থাকো ?

—আজ্ঞে এই পাহাড়েই।

—সামান্য কটা টাকার লোভে তোমরা নিজেরাই নিজেদের সর্বনাশ ডেকে আনছ! জান, এই সবুজ বনবীথির মধ্যেও প্রাণ আছে। প্রতিটি কুঠারাঘাতের সঙ্গে বাতাসের হু হু শব্দে ওদের বুকফাটা কান্না তোমাদের অভিশাপ দেয়। এইভাবে গাছ কাটতে কাটতে এই অরণ্য যেদিন নির্মূল হয়ে যাবে সেদিন কোন শেঠজীই আর টাকার থলি নিয়ে এগিয়ে আসবে না তোমাদের কাছে। সেদিন কি হবে একবার ভেবে দেখেছ? সেদিন এই শ্রীহীন প্রান্তরে তোমরা শুকিয়ে মরবে। ঝর্ণার পানি শুকিয়ে যাবে। শীতে শীত পড়বে না। গ্রীষ্মের দাবদাহে যখন চারিদিক জ্বলে পুড়ে খার হয়ে যাবে তখন বৃষ্টির পানি দিতে আকাশে ঘন কালো মেঘ আসবে না। চারিদিক খরায় জ্বলবে। ফসল ফলবে না।

—তাহলে এখন আমরা কি করব ?

—অরণ্যকে রক্ষা করে অরণ্যের অধিকার নেবে! তোমাদের এই অরণ্য জগতে বাইরের কোন মানুষকে সহসা ঢুকতে দেবে না। অবশ্য অরণ্যকে ভালবেসে কোন অরণ্য-প্রেমিক যদি কখনো এখানে এসে উপস্থিত হয় তাহলে তাকেই শুধু উপযুক্ত মর্যাদা দিয়ে বরণ করে

নিও। এই অরণ্যের ফুল ফল সব কিছু শুধু তোমরাই ভোগ করবে।

এক বৃদ্ধ পাহাড়ি এগিয়ে এসে বলল—সবই তো বুঝলুম মা। কিন্তু এখন যে আমরা না খেয়ে মরব তাহলে।

—সে ব্যবস্থা আমি করে দেবো।

—কিন্তু মা! তোমার বয়স কম। কে তুমি, কোথা থেকে এলে জানি না তাও। এই অরণ্যে যেমন বাঘ ভালুক আছে তেমনি আছে চোর ডাকাত এবং নানা ধরনের হিংস্র মানুষের দল। তারা যে আমাদের সুস্থভাবে খেয়ে পরে বাঁচতে দেবে না।

—তাদের শায়েস্তা করার জন্য আমি আছি। তোমাদের প্রধান কে?

—আমি মা।

—নাম কি তোমার?

—হিংলাজ পাটসানি। উড়িষ্যার ঢেনকানালের কাছে দারুথাং-এ আমাদের পূর্বনিবাস। আমরা বুনো। বনে বনেই ঘুরে বেড়াই।

—এই বনে তোমরা কত দিন আছো?

—তা মা কম করেও বছর বারো তো আছি।

—ঐ শেঠজীর সঙ্গে তোমাদের যোগাযোগ কি ভাবে হল?

—হঠাৎই হয়ে গেল। ঐ শেঠজীই একদিন সরকারের লোকেদের নজর এড়িয়ে আমাদের কাছে এসে লুকিয়ে কাঠ কাটার মতলব দিলে। আমরা টাকার লোভে ওর কথা মতো কাজ শুরু করলাম।

—ঠিক আছে। যা করেছ করেছ আর ও কাজ করো না।

—তাহলে আমরা কি করে বাঁচব মা?

—এই কাজ করার আগে যে ভাবে বেঁচেছিলে সেই ভাবে বাঁচবে। এখন তোমরা আমাদের দুজনকে তোমাদের গ্রামে নিয়ে চলো। আমাদের খুব খিদে পেয়েছে। আপাততঃ কিছু খাওয়া-

দাওয়া করি। তারপর তোমাদের নিয়ে একটু ভাবনা চিন্তা করা যাবে।

—বেশ. তো চলো।

শবনম ওদের একটু অপেক্ষা করতে বলে একাই চলে গেল গাছের গুঁড়িতে বেঁধে রাখা ঘোড়াটাকে খুলে আনতে। কিন্তু কি আশ্চর্য! কোথায় গেল ঘোড়াটা? ওর অন্যমনস্কতার সুযোগ নিয়ে কে খুলে নিয়ে গেল ওটাকে?

শবনম ফিরে এসে বলল—আমার ঘোড়াকে একটা গাছের ডালে বেঁধে রেখে এসেছিলাম। এখন দেখছি সে সেখানে বাঁধা নেই। এটা কি করে সম্ভব! কার এত সাহস?

হিংলাজ হাত জোড় করে বলল—তুমি কে মা তা জানি না। তবে তোমাকে দেখে কোন দেবী অথবা দস্যুকন্যা বলে মনে হচ্ছে। এই পাহাড়ের পশ্চিম দিকে একটি উচ্চ চূড়ায় মস্ত একটি গুহা আছে সেই গুহার ভেতরে হিন্দোল সর্দার নামে এক কুখ্যাত ডাকাত বাস করে। আমার মনে হয় এ কাজ তারই।

—আমি ঐ দস্যু সর্দারের সন্ধান চাই।

—কিন্তু মা। ও বড় নৃশংস। খুন জখম ডাকাতি রাহাজানি সব কিছুরই নায়ক ও। ব্যাংক ডাকাতি, ট্রেন ডাকাতি কি না করে ও। আমরা সবাই ওকে যমের মতো ভয় করি। দূর থেকে ওকে দেখতে পেলে লুকিয়ে পড়ি আমরা।

তাই—নাকি?

—হ্যাঁ।

—আমি যে ঐ লোককেই খুঁজে বেড়াচ্ছি হিংলাজ। আমাকে একবার ওর কাছে নিয়ে যাবে?

বলার সঙ্গে সঙ্গেই পিছন থেকে কে বা কারা যেন বলে উঠল—আমরা তোমাকে আমাদের সর্দারের কাছে নিয়ে যাবার জন্যই এখানে এসেছি দেবী।

যারা এসেছে তাদের দিকে তাকিয়ে ভয়ে বুক শুকিয়ে গেল রঞ্জনের। কী ভয়ানক চেহারা তাদের। যেন এক একটি জ্যান্ত নরখাদক।

শবনম বলল – তোমরা কারা ?

– আমরা হিন্দোল সর্দারের লোক।

পাহাড়ি লোকগুলোও ভয় পেয়ে গেল এই লোকগুলোকে দেখে।

শবনম কিন্তু একটুও ভয় পেল না। বলল—ঠিক আছে চলো। দেখি তোমাদের সর্দার কি রকম। যদি বুঝি তো তোমাদের দলেই ভিড়ে যাবো আমি। তবে তোমরা খুব ভীতু আর অকর্মণ্য। নাহলে কাল রাতে তোমাদের চার চারজনকে ঘুম পাড়িয়ে দিলাম অথচ তোমরা আমাদের কিছুমাত্র করতে পারলে না।

—বেশি বাজে কথা না বলে আমাদের সঙ্গে এসো।

— আমার ঘোড়া কই ?

—ও ঘোড়া তোমার কেন হবে ? আমাদের ঘোড়া আমরা খুলে নিয়ে গেছি। এখন আমাদের বন্দুকটা ভালোয় ভালোয় দিয়ে দাও দেখি।

শবনম বলল বন্দুক নিয়ে কি করবে ? কাক মারবে ! এ বন্দুক তোমাদের হাতে শোভা পায় না। যারা চার চারজন সঙ্গীর মরণদশা দেখেও বিনা যুদ্ধে পালিয়ে যায় তাদের হাতে বন্দুকের বদলে একটা করে ছাতার বাঁট ধরিয়ে দেওয়াই উচিত।

এই কথা শুনে একজন হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ল শবনমের ওপর। তারপর গায়ের জোরে ওর হাত থেকে কেড়ে নিল বন্দুকটা। বলল —সখ মন্দ নয়। ফুলন দেবী হবে। যা ভাগ।

কিন্তু শবনমের মধ্যে যে প্রেতিনী ভর করেছে তার ব্যাপারে ওরা সচেতন ছিল না বলেই এই ভুলটা করে বসল। নাই বা থাকল বন্দুক। শবনম রিভলভারটাই কাজে লাগাল এবার। কোমর থেকে সেটা টেনে নিয়েই ছুটিয়ে দিল 'দড়াদ্দুম'। টিপ টাপ করে কলাগাছ

পড়ার মতন পড়ে গেল দু'তিন জন। বাকি একজন বন্দুক ওঠাবার চেষ্টা করতেই হঠাৎ একটা পাথর এসে লাগল তার মুখে। লোকটি আর্তনাদ করে পড়ে গেল।

কে ছুঁড়ল পাথর!

রঞ্জন বলল—আমি।

শবনম ওর পিঠ চাপড়ে বলল—সাবাশ দোস্ত। এই তো হাত খুলে গেছে তোমার। এসো তোমাকেই আমি এই পাহাড় বনের রাজা করে দিই। তারপর দখল করি হিন্দোল সর্দারের কেল্লা। আল্লার দোয়া যদি হয় তো ওকে আমি প্রাণে মারব না রঞ্জন। ওর দুটো হাত কেটে নিয়ে তোমাদের কালি ঠাকুরের মতো আমার কোমরে বেঁধে নৃত্য করব।

—কিন্তু আমরা দুজনে কি পারব এ কাজ করতে?

—কে বললে আমরা দুজন? এই তো আমাদের বন্ধুরা সব দলে দলে রয়েছে এখানে। পারবে না তোমরা আমাদের সাহায্য করতে?

হিংলাজ সর্দার ছুটে এসে শবনমের পায়ের কাছে হাঁটু গেড়ে বসল। বলল—পারবো মা। নিশ্চয়ই পারব। ঐ হিন্দোল সর্দার বড় অত্যাচারী। ও বা ওর দলের লোকেরা মা বোনেদেরও মর্যাদা দেয় না। ওর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে আমার একমাত্র মেয়ে গলায় দড়ি দিয়ে মরেছে।

শবনম চিৎকার করে উঠল—আর তুমি বদলা না নিয়ে চুপচাপ বসে আছো?

—কি করব মাগো, আমরা যে গরীব লোক। মংঘীরামের মতো লোকেরা তাদের সুবিধার জন্য আমাদের ডাকে। কিন্তু আমাদের বিপদে আমাদের ডাকে কেউ এসে পাশে দাঁড়ায় না। তাছাড়া আমরা দুর্বল। কুড়ুল দিয়ে গাছ কাটতে পারি। শুধু হাতে দুশমনের সঙ্গে লড়ে যেতে পারি কিন্তু বন্দুকের সামনে তো রুখে দাঁড়াতে

পারি না।

—কেন পারো না? মরবার ভয়ে? কই তোমার মেয়েটা তো গলায় ফাঁস দিয়ে লটকাবার সময় মরবার ভয় করল না। তাহলে তুমি কেন মরবার ভয় করছ?

—তুমি ঠিক বলেছ তো মা। এই কথাটা তো আমি কখনো ভাবিনি। আজ এই মুহূর্তে আমি আমার মরা মেয়ের নামে শপথ করে বলছি আমি আমার লোকজন নিয়ে এখন থেকেই তোমার দাস হয়ে গেলাম।

—কতজন আছো তোমরা?

—আমরা উনিশজন আছি। তাছাড়া আমাদের বউ বাচ্চা সব আছে।

—তোমাদের বসতি কতদূরে?

—আমাদের নিয়ে চলো সেখানে। আর এই আহত লোকটিকেও হাত পা বেঁধে নিয়ে চলো। ওর পেট থেকে কিছু কথা আদায় করতে হবে।

হিংলাজ গর্জে উঠল—এই। বাঁধো ইসকো। লে চলো ঝোপড়ি পর।

শবনম বলল—আমাদের খুব খিদে পেয়েছে। তোমরা তোমাদের ডেরায় নিয়ে গিয়ে আগে আমাদের কিছু খাবার ব্যবস্থা করে দাও। তারপর আমরা দলবদ্ধ ভাবে মোকাবিলা করব হিন্দোল সর্দারের।

হিংলাজ বলল—এসো মা। গরীবের কুঁড়েতে পায়ের ধুলো দেবে এসো।

ওরা হিংলাজকে অনুসরণ করল।

তিন

পাহাড়ীদের সঙ্গে পায়ে পায়ে ওরা যখন একটু নীচুতে এক অপূর্ব পাহাড়িয়া গাঁওতে এসে হাজির হ'ল তখন নয়ন মন ভরে গেল। ওরা যাওয়া মাত্রই এখানকার আঞ্চলিক দেশীয় প্রথায় শিঙা আর ডুগডুগি বাজিয়ে অভ্যর্থনা জানানো হ'ল ওদের।

শবনম বলল—এখন থেকে আমরা দুজন তোমাদের গ্রামে এইখানেই থাকব। তোমরা আমাদের জন্য একটা ঘরের ব্যবস্থা করো।

কিছু লোক সঙ্গে সঙ্গে বাঁশ কঞ্চি তালপাতা ইত্যাদি নিয়ে লেগে গেল ঘর তৈরীর কাজে। এই অপূর্ব প্রাকৃতিক পরিবেশে পাহাড়ের একটি ঢালের গায়ে ওরাই দেখিয়ে দিল ওদের উপযুক্ত স্থান। এখান থেকে নীচেকার দৃশ্য অতি মনোরম। বহু দূরে আরো উচ্চ-স্থানে ঘন অরণ্যের মধ্যে একটি মোচাকৃতি পাহাড়ের চূড়ায় একটি গুহা নজরে পড়ল।

হিংলাজ বলল—ঐ হ'ল হিন্দোল সর্দারের কেল্লা। ঐ অরণ্যদুর্গে এক সময় এক চোখো এক অসুর বাস করত। শোনা যায় সেই অসুর ছিল এই অঞ্চলের রাজা। ঐ গুহায় সে অনেক ধনরত্ন সঞ্চিত রেখে একবার এক প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে লড়াই করতে যায়। সেই যাওয়াই তার শেষ যাওয়া। আর ফেরে না। ঐ গুহার জঠরে কোথায় যে তার ধন সম্পদ সে পাথরের আড়ালে লুকিয়ে রেখেছে তা কেউ জানে না। এসব হ'ল পুরনো দিনের কথা। কয়েক বছর আগেও এখানে আমরা সুখে শান্তিতে ছিলাম। এখন নিত্য নতুন উপদ্রবে আমরা সদা শঙ্কিত থাকি।

এই সব কথা শুনতে শুনতে শবনমের চোখ দিয়ে যেন আগুন ঠিকরোতে লাগল। শুধু বলল—তোমাদের মা কালী আর দেবী দুর্গা যখন অসুর নিধন করেন তখন তাদেরই মধ্যে থেকে কয়েকটা ছিটকে

ছাটকে পাতালে টাতালে গিয়ে লুকিয়ে পড়েছিল। এখন তারাই এসে তোমাদের জ্বালিয়ে মারছে। আমি মা কালী আর দেবী দুর্গার কৃপায় নবশক্তিতে নবরূপে ভয়ংকরী মূর্তিতে এখানে এসে হাজির হয়েছি। শুধু তোমরা আমার সঙ্গে থেকো। ঐ কেল্লা দখল করে আমি থাকব ওখানে। আমি অতন্দ্র প্রহরীর মতো সদা সর্তক হয়ে পাহারা দোবো তোমাদের। আমি সর্বহারা হয়ে এখানে এসেছি। তোমরা আমাকে দেখো। আমি তোমাদের দেখব।

শবনমের রুদ্র মূর্তি, রক্তচক্ষু এবং ঐ ডাকাতরাণীর মতো পোষাক দেখে ওর কথাটা যে নেহাৎই ফাঁকা বুলি তা বলে কেউ মনে করল না। সবাই বিশ্বাস করল, হ্যাঁ এবার সত্যিকারের এমন একজন ওদের মাঝে এসেছে যে কিনা ওদের হয়ে লড়তে পারবে।

শবনম বলল—শোনো, শুধু হাতে ঐ দুর্ধর্ষ ডাকাতদের সঙ্গে লড়াই করা যায় না। তাই আমি তোমাদেরকেও বন্দুকবাজি শেখাব। ওরা দলে কত জন আছে জানো?

—তা পনেরো কুড়িজন তো বটেই।

—তার মধ্যে কয়েকজনকে আমি একাই মায়ের ভোগে পাঠিয়ে দিয়েছি। বাকি গুলোকে আমরা সবাই মিলে দেবো। ওদের একটা লোক তো আমাদের হাতে বন্দী হয়েছে।

— হ্যাঁ।

—লোকটাকে কড়া পাহারায় রাখো। ওকে মোচড় দিয়েই ওদের গুপ্তকথা আমি টেনে বার করব।

একজন বলল—একটা শিরিষ গাছের গুঁড়ির সঙ্গে শক্ত করে বেঁধে রেখেছি ওকে।

—ঠিক আছে। তোমাদের কিছু লোক এই এলাকাটা পাহারা দাও এবার। যাতে ওরা আচমকা এখানে এসে উপদ্রব করতে বা ঐ লোকটাকে ছাড়িয়ে নিয়ে যেতে না পারে। আর ওদের বন্দুকগুলো আমার জিম্মায় রেখে লাশগুলো ফেলে দাও পাহাড়ের খাদে।

সবাই মন্ত্রমুগ্ধর মতো শবনমের কথা শুনে গেল। রঞ্জন ওর মায়ের মুখে শুনেছে ঠাকুর দেবতার 'ভড়' হওয়ার কথা। 'ভড়' যদি ভন্ডামি বা ভড়ং না হয় তাহলে নাকি ঐ অবস্থায় সে যাকে যা বলে তাই ফলে, শবনমের মধ্যেও কি ঐ রকম কোন শক্তি 'ভড়' করল? না হলে চোদ্দ পনেরো বছরের একটি মেয়ের মধ্যে এত বিক্রম এলো কি করে? এই সামান্য সময়ের মধ্যে এতগুলো দুর্ধর্ষ মানুষের জীবনান্ত যেন রূপকথার গল্পের মতো ঘটে গেল। এই কিশোরীর ব্যক্তিত্বর কাছে এই পাহাড়ী মানুষগুলো যেন হুকুমের চাকর হয়ে উঠল। এর রহস্য কি? কোন শক্তির প্রভাবে এই অসম্ভব সম্ভব হ'ল!

হিংলাজ সর্দারের মাটির দাওয়ায় ওদের জলখাবারের ব্যবস্থা হ'ল! আলু ভাজা, মুড়ি আর ভেলিগুড়ের হালুয়া।

একটি সাত আট বছরের বালিকা এসে ডেকে নিয়ে গেল ওদের। কালো কষ্টিপাথরের মতো ছোট্ট মিষ্টি মেয়েটি।

ওরা মুখ হাত পা ধুয়ে দাওয়ায় পাতা চাটাইতে বসে জলযোগ করতে লাগল। এর সঙ্গে এলো মশলা দেওয়া চা। ভারি চমৎকার। খেয়ে মুখ ছেড়ে গেল যেন।

একটা কুকুর অনেকক্ষণ থেকে ছোঁক ছোঁক করছিল।

শবনম সামান্য দুটি মুড়ি ছড়িয়ে একটু হালুয়া দিতেই কুকুরটার আনন্দের আর অবধি রইল না। সে ঘন ঘন লেজ নেড়ে তার আনুগত্য প্রকাশ করতে লাগল।

রঞ্জনের খুব ভালো লেগে গেল এখানকার আরণ্যক পরিবেশ। হিংলাজ পাটসানির দাওয়ায় বসেই অরণ্যের গভীরতা উপলব্ধি করা যায়। এ বাড়ির চৌহদ্দির বাইরেই ধানের গোছার মত বড় বড় সাবাই ঘাসের সবুজ শোভা মনকে মোহিত করে দেয়।

ওরা পেট ভরে জলখাবার খেয়ে দাওয়ায় নেমে পায়চারি করতে লাগল। আর কুকুরটা ঘুরতে লাগল ওদের পায়ে পায়ে। শবনম

ওর মাথায় গায়ে হাত বুলিয়ে ওকে আরো আপন করে নিল।

রঞ্জন বলল—একবার ঐ লোকটার কাছে আমাদের গেলে হোত না ?

—কোন লোকটার কাছে ?

—যাকে শিরিষ গাছের সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়েছে।

শবনম হাসল। হেসে বলল—হ্যাঁ, যেতে তো হবেই। কিছু কথা ওর পেট থেকে বার করতে না পারলে হিন্দোল সর্দারের কেল্লায় ঢোকা যাবে না।

ওরা হিংলাজকে সঙ্গে নিয়ে সেই লোকটির কাছে গিয়ে হাজির হল। রঞ্জনের পাথরের আঘাতে লোকটির নাক কেটে রক্ত ঝরছে। সেই অবস্থাতেই একটি বড় গাছের সঙ্গে পিছমোড়া করে বেঁধে রাখা হয়েছে তাকে। দুজন লোক সমানে পাহারা দিচ্ছে লোকটাকে।

শবনম ভয়ঙ্করী মূর্তিতে লোকটির সামনে গিয়ে দাঁড়াল। রঞ্জন রইল একপাশে।

শবনম লোকটিকে বলল—কি নাম তোর ?

—বলব না।

—হিন্দোল সর্দারের দলে কতদিন আছিস ?

—বলব না।

—দলে তোরা কতজন ?

—বলব না।

লোকটির জেদ দেখে রঞ্জনের মাথায় যেন খুন চেপে গেল। আসলে রক্ত ঝরানোর নেশাটাই একটা উন্মাদনা এনে দেয়। বিশেষ করে এ সব ক্ষেত্রে প্রতিহিংসা প্রবল হয় অতি। কেননা ওদের এই কষ্টের, আজকের এই বনবাসের মূলেই তো এরা। রঞ্জন বলল—এখনো বলছি যা জিজ্ঞেস করব ভালোভাবে তার উত্তর দিবি। না হলে কিন্তু জীবন সংশয় হবে তোর।

লোকটি রক্তচক্ষুতে রঞ্জনের দিকে তাকিয়ে থুঃ করে একটু থুতু

ছেটাল।

অমনি রঞ্জন একটা শক্ত মোটা গাছের ডাল ভেঙে বেধড়ক পেটাতে লাগল লোকটাকে। সে কি প্রচন্ড মার। সারা গায়ে কালসিটে পড়ে গেল। লোকটি তবুও জেদের সঙ্গে বলল— বলব না।

এমন সময় রঙ্গমঞ্চে একজনের আর্বিভাব হ'ল।

এক বিশাল শরীর ঘোড়া থেকে নেমে ঘোড়াটিকে একটি গাছের ডালে বেঁধে সর্দপে এগিয়ে এসে বলল—এ উল্লুকে পাঁট্ঠে। তুম সব কাম পর নেহি গিয়া কিঁউ ?

পাহাড়িরা নীরব। সবাই শবনমের দিকে তাকাল।

শবনম বন্দীর দিক থেকে নজর সরিয়ে আগন্তুকের দিকে তাকাল। তারপর বলল—কৌন হো তুম ?

আগন্তুক বলল—তুম কৌন হো ?

— আমি এই অরণ্যের দেবী।

—দেবী ? হিঁয়া দেবী টেবী কুছ হ্যায়ই নেহি। বলে পাহাড়ীদের বলল—চলো, তুম সব কাম পর চলো। তারপর বেঁধে রাখা লোকটির দিকে তাকিয়ে বলল, এ আদমি কৌন হ্যায় ?

শবনম বলল—আমার শিকার।

—শিকার ? মেরা সমঝমে তো কুছ নেহি আতা।

শবনম এবার পরিষ্কার করে বলল—তুমিই বুঝি শেঠ মংঘীরামজী ?

—হাম কৌন হ্যায় এ মাৎ পুছো। বলে পাহাড়ীদের বলল চলো চলো, কাম পর চলো।

শবনম বলল—না। আজ থেকে ওরা আর কেউ তোমার কাজে যাবে না। তোমার বাত ভী শুনবে না। আমি এই পাহাড় বনের রাণী। এখানকার দেবী। আমি যা বলব তাই শুনবে ওরা।

মংঘীরাম চিৎকার করে উঠল—নেহি। ও লোগ হামারা বাত

শুনেগা। কাম করনেহি পড়েগা সবকো।

—না করলে ?

—জিন্দা মার ডালুঙ্গা।

শবনম বলল—মংঘীরামজী, এতদিনে তোমার পালা শেষ। গাছ প্রতি বিশ রুপিয়া হাতে গুঁজে দিয়ে অনেক ফায়দা লুটেছ তুমি। এখন তার খেসারৎ দাও। কুড়ি টাকার গাছ লক্ষ টাকায় বেচেছ। অসহায় মানুষগুলোর রক্ত চুষে তুমি হয়েছ শেঠ। কিন্তু আর তো তা হচ্ছে না।

মংঘীরাম চেঁচিয়ে উঠল—তুম সব খাড়ে হোকর ক্যা দেখতে হো? এ লেড়কি তুমহারা রোটি মারনে মাংতা। পাকড়ো ইসকো। বলেই ডাকল—আগারাম, বাগারাম ইধার আ যাও তো।

বলার সঙ্গে সঙ্গেই দুজন তাগড়াই চেহারার ভোজপুরী এসে দাঁড়াল সেখানে।

শবনম বলল খবরদার! আগে মাৎ বাড়ো। বলেই পাহাড়িদের বলল—তোমরা মংঘীরামকে ধরে রাখো। ওর সঙ্গে একটু বেশি রকম বোঝাপড়া করতে হবে আমাকে।

পাহাড়ি লোকগুলো তখন ঝাঁপিয়ে পড়ল মংঘীরামের ওপর। তারপর ওকেও বেশ শক্ত করে বেঁধে ফেলল একটা গাছের সঙ্গে।

ভোজপুরী দুটো মংঘীরামকে উদ্ধার করবার জন্য আসছিল। কিন্তু শবনমের বন্দুক ও পাহাড়িদের বিরুদ্ধ আচরণ দেখে ভয় পেয়ে গেল ওরা। তাছাড়াও শবনমের গা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে থাকা কুকুরটার মতিগতি ওদের সুবিধের মনে হল না। কুকুরটা কেমন যেন ক্রুদ্ধ চোখে আক্রমণাত্মক ভঙ্গীতে ওদের দিকে তাকাচ্ছে।

মংঘীরাম বাঁধা পড়ে ছটফট করতে লাগল।

শবনম ওর বুকে বন্দুকের নল ঠেকিয়ে বলল - শোনো মংঘীরামজী এখন থেকে আমি এই জঙ্গলের দেখাশোনা করব। এখানকার মানুষজন আমার প্রজা। তাই এদের রক্ষণা বেক্ষণের জন্য আমার

কিছু টাকার প্রয়োজন। তুমি এদের ঠকিয়ে এদের আসল প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করে অনেক অর্থ রোজকার করেছ। তার এক মুঠো আমার এখুনি প্রয়োজন। আশা করি আমার ক্ষমতা সম্বন্ধে এতক্ষণে তোমার একটা ধারণা জন্মে গেছে। তুমি অবিলম্বে লাখ খানেক টাকা আমাকে পাঠিয়ে দেবে।

মংঘীরাম চেঁচিয়ে বলল—নেহি, হাম পুলিশকো বুলায়গা।

মংঘীরামের কথা শুনে আকাশ কাঁপিয়ে হেসে উঠল শবনম। বলল—যাও। আভি যাকে বোলাও। বলে বলল—তুমি জঙ্গলের কাঠ চোরাই পথে চালান দাও। তুমি যাবে পুলিশের কাছে? ওসব ভয় অন্য লোককে দেখাবে। খুব শিগ্‌গির আমি হিন্দোল সর্দারের কেল্লা দখল করব। তখন আর আমার কোন অভাব থাকবে না। কিন্তু যতক্ষণ না তা করি ততক্ষণ তুমি আমাকে টাকার যোগান দেবে।

—ঠিক হ্যায়। রুপিয়া মিল যায়ে গা, লেকিন—।

—লেকিন টেকিন কিছু নেই। আমার টাকার দরকার। টাকা চাই। তোমার সঙ্গে আমার শত্রুতার নয় বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠুক এই আমি চাই।

মংঘীরাম এবার যেন বুকে বল ফিরে পেল। বলল—তব তো রুপিয়া জরুর মিলেগা। তো তুম এক কাম করো। হামারা সাথী হো যাও। দোস্তি করো। আউর তুমহারা আদমি কো বোলো জঙ্গল কাটনে কে লিয়ে।

—না। জঙ্গল কাটা চলবে না। তুমি অন্য কোন বিজনেসের ধান্দা করো মংঘীরামজী। এখন এদের ঠকিয়ে যে পয়সা কামিয়েছ তা একটু একটু করে ফেরৎ দাও। আমি জানি তুমি পুলিশের কাছে যাবে না। গেলে বিপদে পড়বে। তাই বলি ভালোয় ভালোয় নোট ছাড়ো। নাহলে কিন্তু তোমার বাড়িতে গিয়েও চড়াও হবো আমরা। হিন্দোল সর্দারকে তুমি কত করে টাকা দাও?

—আমি কাউকে কিছু দিই না।

—মিথ্যে কথা। হিন্দোল সর্দার এই পাহাড় বনের সন্ত্রাস

ওর বুকে বন্দুকের নল ঠেকিয়ে···পৃঃ ৬১

সে এক কুখ্যাত দস্যু। তার এলাকায় এসে তুমি লাখ লাখ টাকার সম্পদ কেটে নিয়ে যাবে আর সে দিনের পর দিন মুখ বুজে

তাই দেখবে, এ কথা আমাকে বিশ্বাস করতে বলো ? বলো কত করে দাও তাকে ?

মংঘীরামজী মাথা হেঁট করে বলল—তাকে যা দিই তোমাকেও যে তাই দেবো সে আশা তুমি কোর না খুকি।

শবনম চমকে উঠল—খুকি কি ? দেবী বলো।

—হাঁ হাঁ দেবীজী। তবে একটা বাত আমার বলবার আছে। হিন্দোল সর্দারের সঙ্গে লড়বার আগে নিজের ক্ষমতাটা একটু বাজিয়ে দেখো। আমাদের বীচ্‌মে তুমি খাড়া হলে তুমি আর জিন্দা থাকবে না। তোমার লোক ভি মরবে। তুমি ভি মরবে।

শবনম বলল—শোনো। তোমার সামনে ঐ যে লোকটা বাঁধা রয়েছে দেখছ ও হিন্দোল সর্দারের লোক। ওদের দলের বেশ কয়েকজনকে আমি শেষ করেছি। এবার ওকেও করব। আমি তোমাকে মারব না। কেননা আমার অর্থের এবং অন্যান্য প্রয়োজনে কই মাছের মতো জিইয়ে রাখব তোমাকে। যতক্ষণ কথা শুনবে ততক্ষণ ঠিক থাকবে। অন্যমতি হলেই 'ডিস্যুম'। কি বুঝলে ? আর হ্যাঁ, এখন থেকে হিন্দোল সর্দারের পাওনাটা আমিই নেবো। আজ থেকেই ওর টাকা বন্ধ করে দাও তুমি।

—হিন্দোল সর্দারের সঙ্গে দুশমনি করলে ও আমাকে প্রাণে মারবে।

—আমার কথা না শুনলে আমিও তোমাকে প্রাণে মারব। এখন তোমাকে আমি মুক্তি দেবো। আজ সন্ধ্যার মধ্যে তুমি আমাকে এক লাখ টাকা পৌঁছে দেবে। আর কিছু বন্দুক ও কার্তুজ কয়েক দিনের মধ্যে পাঠিয়ে দেবে এখানে। এই পাহাড়িদের আমি যুদ্ধ করা শেখাবো। না হলে এরা চিরকাল পড়ে পড়ে মার খাবে।

—কিন্তু জঙ্গল কা লকড়ি নেহি মিলনে সে হাম তো মর যাউঙ্গা দেবী জী।

শবনম বলল—তোমার মতন লোকের কখনো শুধু একটা লকড়ির ব্যবসা থাকতে পারে না। তোমার আরো অনেক ব্যবসা নিশ্চয়ই আছে। তুমি সেই দিকে নজর দাও। যাও। এখুনি গিয়ে টাকার ব্যবস্থা করো।

মংঘীরামজী একটুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর বলল—ঠিক হ্যায়। ছোড় দিজিয়ে।

শবনম পাহাড়িদের বলল মংঘীরামকে ছেড়ে দিতে।

মংঘীরামজী ছাড়া পেল। ছাড়া পেয়ে চলেও গেল।

শবনম আবার তাকালো বন্দীর দিকে। বলল—এই তোমাকে শেষ সুযোগ দিলাম বলবার। কিছু বলবে?

—না।

শবনম বলল—এই লোকটাকে তোমরা পিছমোড়া করে বেঁধে গলা পর্যন্ত পুঁতে রাখো। আর ওর মুখের কাছে রেখে দাও কয়েকটা শুকনো রুটি এবং এক গেলাস জল।

পাহাড়িরা এখন রীতিমতো ক্ষেপে উঠেছে। যে মংঘীরামকে ওরা বাঘের মতো ভয় করত সেই মংঘীরামকে এই এক রত্তি মেয়েটা কি ভয়ংকর ভাবেই না শাসিয়েছে। আর ঐ হিন্দোল সর্দার! ফণা-ওয়ালা গোখরো সাপ একটা। তারও বিরুদ্ধে যে কঠিন সংগ্রাম করেছে মেয়েটি তা রীতিমতো দুঃসাহসিক। এ মেয়ে তো মেয়ে নয়, যেন এক দেবকন্যা। দৈবশক্তি না থাকলে এই অসম্ভব কি করে সম্ভব হয়?

শবনমের কথায় ওরা ধৃত লোকটাকে পিছমোড়া করে বেঁধে ফেলল। তারপর সত্যি সত্যিই কোদাল গাঁইতি নিয়ে এই কঠিন শিলাস্তরের বুকে যেখানে একটু মাটি আছে সেখানে গর্ত খুঁড়তে লাগল।

এতক্ষণে ভয় পেল লোকটি। বলল—ম্যায় সব কুছ বতাতা হুঁ। লেকিন ।

—লেকিন? লেকিন কি?

—লেকিন। আমার কথা শেষ হলেই তোমরা আমাকে গুলি করে মারবে।

রঞ্জন বলল—শুধু শুধু মারব কেন?

লোকটি বলল—তোমরা যদি না মারো হিন্দোল সর্দার মারবে। তবে সে মৃত্যু হবে অতি নৃশংস। হাত পা কেটে চোখ উপড়ে জিভ টেনে বার করে মারবে।

—বেশ। তাই করব। এখন বলো ঐ গুহা দুর্গে যাবার উপায় কি? শুনেছি ওর ধারে কাছে নাকি যাওয়া যায় না।

—না। ঐ দুর্গের মধ্যে বেশ কয়েকটি গুপ্ত কক্ষ আছে। কেউ ভুল করেও তার পাঁচশো গজের মধ্যে গিয়ে পড়লে সেই গুপ্ত কক্ষের ভেতর থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি ছুটে আসে। যদি কোন রকমে সেই আসন্ন মৃত্যুকে আড়াল করে গুহাতে পৌঁছানো যায়। তাহলেও কিন্তু রহস্য ভেদ হবে না। তার কারণ ঐ গুহার গোলক ধাঁধায় অনেক সময় আমরাও ধাঁধিয়ে যাই।

—বেশ, এখন প্রশ্ন, ঐ গুহার পিছন দিকে আর কোন গুপ্তপথ আছে কিনা?

—বলতে পারব না। তবে মনে হয় নেই। কেননা গুহাটি প্রকৃতির অদ্ভুত খেয়ালে এমনভাবে সৃষ্ট হয়েছে যে এই গুহায় প্রবেশ করে পাতাল পুরীর মতো ক্রমশ অনেকটা পথ নামবার পর দেখা যাবে গুহাটা প্রশস্ত হয়েছে। আসলে ঐটি একটি ফাঁপা পর্বত বলা যেতে পারে।

—হুঁ। দলে তোমরা কতজন আছো?

—এখনো পর্যন্ত জীবিত আছি এগারোজন।

—পরশু মধ্যরাতে যে ভয়ংকর ট্রেন দুর্ঘটনাটি ঘটে ওটিতে তোমরা কারা অংশ নিয়েছিলে ?

—ওটি নেহাৎই দুর্ঘটনা। ওতে আমাদের কোন হাত ছিল না।

রঞ্জন তখন সজোরে একটা ঘুসি মেরে দিয়েছে লোকটির মুখে ! সেই ঘুসির আঘাতে ঠোঁটের কষ বেয়ে রক্ত নেমে এলো। রঞ্জন বলল—আমরা স্বচক্ষে দেখেছি কিছু লোক যাত্রীদের জিনিসপত্তর লুণ্ঠন করছিল। এই অঞ্চলে তোমরা ছাড়া কারা করবে ঐ সব কাজ ?

—মংঘীরামজীও সাধুপুরুষ নন। তাঁর লোকজন অথবা অন্য দলও এ কাজ করতে পারে।

—মংঘীরামের দলের লোক কত ?

—তা বিশ পঁচিশজন হবে।

—লুঠের মাল পত্তর ওরা রাখে কোথায় ?

—মংঘীরামজীর গোডাউনে।

—ঠিক বলছ ?

—মিথ্যে বলে লাভ ?

—মংঘীরামজীর গোডাউন কোথায় ?

—এই পাহাড়ের নীচে যে নদীটা আছে, সেই নদীর ওপারে হনুমান মন্দিরের পিছনে।

—দুর্ঘটনাস্থল থেকে জায়গাটা কত দূর ?

—তা এক কিলোমিটার তো হবে।

শবনম বলল – দুর্ঘটনা যখন ঘটে তখন কি তুমি সেখানে ছিলে ?

লোকটি নীরব।

—বলো ছিলে কিনা ?

—ছিলাম।

– এই কাজ করার আগে বিবেকে একবার বাধল না ? লুঠের

মাল তো মংঘীরাম আর হিন্দোল সর্দার ভাগাভাগি করে নেবে ; কিন্তু তোমরা কোন্ স্বার্থে এই কাজ করতে গেলে ? তুমি কি জানো এই দুর্ঘটনায় আমি আমার আব্বাজানকে হারিয়েছি ! অনেক বাবা-মা তাদের একমাত্র সন্তানকে হারিয়েছে। কত নিরীহ মানুষ সর্বস্বান্ত হয়েছে। সে খবর রাখো ?

লোকটির চোখ দুটি এবার জলে ভরে এলো।

রঞ্জন বলল – এ জল তোমার চোখে মানায় না ভাই।

লোকটি বলল—তাহলে শোনো, তোমাদের বন্দুক থেকে মাত্র একটা গুলি তোমরা আমার জন্যে খরচ করো। নাহলে যতদিন বাঁচব ততদিন এই দুর্ঘটনার কথাটা আমি ভুলতে পারব না। আসলে এই দুর্ঘটনার মূলে ঐ মংঘীরামজী।

—কি রকম !

—সর্দার আমাদের বলেছিলেন ডাউন লাইনের ফিস প্লেট সরিয়ে দিতে। কারণ একটি মালগাড়িকে ফেলে দিয়ে লুঠপাট করবার মতলব ছিল আমাদের। ঘটনাস্থলে হঠাৎ ঐ মংঘীরাম গিয়ে সব গোলমাল করে দেয়। সে বার বার বলতে থাকে, সর্দার নাকি বলেছেন ডাউন নয় আপ লাইনেই খুলতে হবে ফিস প্লেট। আমরা ওর কথা মতো কাজ করতে গিয়েই এই অবস্থা হয়। আসলে যাত্রীবাহী ট্রেন ওলটানোর কোন পরিকল্পনাই ছিল না আমাদের পরে দুর্ঘটনার পর যখন সর্দারকে গিয়ে খবর দিই সর্দার তখন একটা মোটা দাঁও হাতছাড়া হওয়ার ক্ষোভে বোমার মতো ফেটে পড়েন। এতে আমাদের লাভ কিছুই হয় না। মাঝখান থেকে ছিঁচকে চোরের দল সব কিছু লুটে পুটে খায়।

শবনম কিছুক্ষণ লোকটির দিকে তাকিয়ে থেকে বলল—তুমি কাঁদছ কেন ? তোমার তো অনুশোচনা করবার কিছু নেই। কুখ্যাত দস্যুর দলে রয়েছ তুমি। খুন জখম লুণ্ঠন এ সব তো তোমাদের পেশা। তাহলে ?

লোকটি বলল—হ্যাঁ ঠিকই। তবে তোমার মতন মেয়ে আমি কখনো দেখিনি। তোমাকে দেখেই মনে হচ্ছে তুমি কোন ভদ্র ঘরের মেয়ে। কত কম বয়স তোমার। অথচ এই বয়সে যেন ভোজবাজির মতো হঠাৎ একটা ভেল্কি লাগিয়ে দিলে। আমি বুঝতে পারছি তোমার হাতেই আমাদের নিয়তি। নারী শক্তির কাছে অসুরকেও হার মানতে হয়। তাই তোমার কাছেও আমাদের হার মানতে হবে। অত্যাচারী হিন্দোল সর্দার তোমার শক্তিতেই বধ হবেন।

শবনম বলল—তোমার নাম ?

—আমার নাম বিক্রমজিৎ।

—তুমি কতদিন এই দলে আছো ?

—তা কম করেও দশ বছর।

—তুমি পারবে ঐ দল ছেড়ে আমার দলে চলে আসতে ?

—পারব। না পারা ছাড়া উপায় নেই। নাহলে এখান থেকে শুধু হাতে ফিরে গেলে সর্দার আমাকে ছিঁড়ে খাবে। আমি তোমার দলেই থাকব।

—তাহলে অবশ্য আমার সুবিধে হয়। তবে হ্যাঁ, আমি নিরীহ মানুষদের ওপর কোন অত্যাচার করব না। কিন্তু মংঘীরাম ও হিন্দোল সর্দারকে আমি কাঁচা খাবো। ওদের দুজনকে শেষ করেই সাঙ্গ করব আমার হত্যালীলা। তারপর এই অরণ্যদুর্গে হিন্দোল কেল্লা লুন্ঠন করে ঐ গুম্ফার কাছে আমি মন্দির মসজিদ বানিয়ে আমার জীবন উৎসর্গ করব। একদিকে আমার এই তরুণ বন্ধুটি দেবী দুর্গার স্তোত্র পড়বে। অপর দিকে আমি আজান দেবো 'আল্লাহ আকবর' বলে। আর ও যদি থাকতে না চায়, তাহলে কোন সাধু সন্ন্যাসীকে এনে আশ্রম করতে বলব এখানে। ব্যস। আমার কাজ শেষ। তোমরা যারা আমার কাছে থাকবে তাদের সঙ্গেই আমি হাতে হাত মিলিয়ে রক্ষা করব এই বনভূমিকে। আমরা কেউ না থাকলে এই

অরণ্য আবার সমাজ বিরোধীদের ঘাঁটি হয়ে উঠবে।

শবনমের নির্দেশে বিক্রমজিৎকে ছেড়ে দেওয়া হ'ল।

পাহাড়িরা বিক্রমজিৎকে ওদের ঘরে নিয়ে গিয়ে প্রাথমিকভাবে একটু শুশ্রূষা করল। তারপর ক্ষতস্থান গুলোতে দেশীয় প্রথায় কিছু গাছ গাছড়ার রস লাগিয়ে ছেঁড়া কাপড় দিয়ে একটু বেঁধে ছেঁদে দিল। এরপর হিংলাজ সর্দারের দাওয়ায় বসিয়ে পেট ভরে গুড় মুড়ি খাওয়ানো হ'ল ওকে।

বিক্রমজিৎ এখানকার সকলেরই অত্যন্ত পরিচিত। কেননা এই পাহাড় জঙ্গলে হিন্দোল সর্দারের লোক হিসাবে অবাধ গতিবিধি ছিল ওদের। একদিন এই লোকের চেহারা দেখলেই গ্রামবাসীরা ভয়ে পালাত। আর আজ এমন ভাবে কালের চাকা ঘুরে গেল যে সেই লোকই দাওয়ায় বসে অতিথি হয়ে ক্ষুধার খাদ্য গ্রহণ করছে।

খেয়ে দেয়ে বিক্রমজিৎ আবার শবনমের কাছে এলো। শবনম তখন ওর ঘর তৈরী দেখছে।

রঞ্জন তদারক করছে।

অন্যান্য পাহাড়িরা দলবদ্ধ হয়ে কেউ কাজ করছে কেউ বা নজর রাখছে দুর্গের দিকে। হঠাৎ যদি সেদিক থেকে কোন আক্রমণ আসে তাই।

বিক্রমজিৎ শবনমকে বলল—দেবী!

শবনম বলল—কিছু বলবে?

—তোমার ঘোড়াকে আমিই খুলে নিয়ে গিয়েছিলাম। বাইরে একটু দূরে একটা বড় গাছের সঙ্গে বেঁধে রেখে এসেছি। নিয়ে আসব সেটাকে?

—নিশ্চয়ই। ঘোড়ায় না চেপে আমার পক্ষে শুধু পায়ে হেঁটে দূর দূরান্তরে যাওয়া অসম্ভব। তুমি নিশ্চয়ই যাবে। শুধু ঐ ঘোড়াটা নয় অন্যগুলোকেও যদি দেখতে পাও ধরে নিয়ে এসো।

—অন্যগুলো ছাড়া পেয়ে ওদের ডেরাতেই ফিরে গেছে। ঐ

ঘোড়াটা বাঁধা ছিল। তাই ওটাকেই আমরা ফিরে পাবো।

রঞ্জন বলল—ইতিমধ্যে ঐ ঘোড়াটাকে কেউ খুলে নিয়ে যায় নি তো ?

—কে নিয়ে যাবে ? আমরা যারা এখানে এসেছিলাম তাদের মধ্যে একমাত্র আমিই তো জীবিত আছি।

শবনম বলল - ঠিক আছে যাও।

বিক্রমজিৎ ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে চলল। তারপর আঁকা-বাঁকা পার্বত্য পথে কিছুদূর গিয়ে একটি বড় পাথরের আড়ালে সেগুন গাছের গুঁড়ির সঙ্গে বেঁধে রাখা সেই সাদা ঘোড়াটাকে বাঁধন মুক্ত করেই লাফিয়ে তার পিঠে চড়ল। ঘোড়াও আর বিলম্ব করল না। বিক্রমকে পিঠে নিয়ে খটাখট শব্দ তুলে এগিয়ে চলল হিন্দোল কেল্লার দিকে।

পাহাড়িদের এই ছোট্ট বস্তীতে মুরগীর অভাব ছিল না। কাজেই গরম ভাত আর মুরগীর মাংস দিয়ে দুপুরের খাওয়াটা দম ভোর খেয়ে নিল ওরা। খাওয়া-দাওয়ার পর একটু বিশ্রামের জন্য ওদের নতুন পর্ণকুটীরে এলো ওরা। খড় বিছিয়ে চাটাই পেতে সুন্দর বিছানা হয়েছে দুটো।

শবনম ও রঞ্জন দুজনেই দুপাশে দুরত্ব বজায় রেখে শুয়ে পড়ল।

রঞ্জন বলল—মানুষকে বিশ্বাস করার ফল দেখলে তো ? কেমন চমৎকারভাবে নিজেকে স্যারেণ্ডার করিয়ে আবার ব্লাফ মেরে পালালো লোকটা।

শবনম বলল—ও যে এমন বিশ্বাসঘাতকতা করবে তা কিন্তু ভাবতেই পারিনি।

—ঐ জন্যেই এই ধরণের ক্রিমিন্যালদের বাঁচিয়ে রাখতে নেই। শত্রুকে হাতে পেয়েও ছেড়ে দেবার ফল কি ভয়ঙ্কর।

—তবে আমার মনে হয় আমাদের শত্রুপক্ষ যে কোন কারণেই

হোক খুব ভয় পেয়ে গেছে।

—কি করে বুঝলে ?

—প্রথমতঃ কাল রাতের ঐ আঘাত ওদের কাছে বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মতো হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ আজ সকালে সশস্ত্র কিছু লোককে আমাদের সন্ধানে পাঠিয়েও ওরা পরাস্ত হয়েছে। সবচেয়ে বেশী আঘাত পেয়েছে এলাকার পাহাড়িরা ওদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে বলে। যে মানুষগুলো একদিন ওদের দেখলে বাঘের মতো ভয় পেত সেই মানুষগুলিই আজ সব ভয় ভীতি ভুলে এমনভাবে মারমুখি হয়েছে যে আর কখনো এদের কব্জা করা ওদের পক্ষে অসম্ভব বলে মনে হয়েছে। এইবার এই এতগুলি মারমুখি মানুষের সামনে দাঁড়িয়ে ওদের ঘাঁটি আগলানো প্রায় দুঃস্বপ্নের মতো।

—তাহলে ?

—তাহলে আর কি। ওরা প্রকাশ্য দিবালোকে তো আসবে না। গভীর রাতের অন্ধকারে আচমকা ওদের মেশিনগান বা রাইফেল ব্যবহার করে পুরো বস্তীটার ওপর হামলা চালাবে। তারপর ঐ ভয়াবহ হত্যাকাণ্ডের পর এলাকা ছেড়ে চলে যাবে কিছু দিনের জন্য। প্রাচীনকালের সেই অসুরও যেমন ঐ গুহার জঠরে তার সর্বস্ব জমা রেখে বরাবরের জন্য চলে গিয়েছিল এদেরও সেই অবস্থাই হবে।

—কিন্তু তোমার কথাই যদি সত্যি হয় তাহলে তো রীতিমতো ভয়ের ব্যাপার। আমাদের উস্কানিতে মেতে ওঠার ফলে এই সব অসহায় মানুষগুলোর মৃত্যুর জন্য আমরাই তো দায়ি হব।

—এইটাই আমার ভয়। তাছাড়া আমাদের এখন উভয় শত্রু। একদিকে মংঘীরাম, অপর দিকে হিন্দোল সর্দার। এই উভয় প্রতিপক্ষকে কঠোর হাতে দমন করতে হবে আমাদের।

—কিন্তু কিভাবে ?

—রঞ্জন ! তুমি একটু জেগে থাকতে পারবে ? আমার বড় ঘুম

পাচ্ছে। আমি ঘুমবো। দুপুরটা গড়িয়ে গেলেই আমাকে ডেকে দেবে কিন্তু। আমি চুপি চুপি একটা বড় গাছের ডালে বসে সারা

বিক্রমকে পিঠে নিয়ে……পৃঃ ৭১

রাত জেগে বন্দুক নিয়ে পাহারা দেবো এদের।

রঞ্জন বলল—ঠিক বলেছ। নাহলে যে কোন মুহূর্তে একটা বিপদ ঘটে যেতে পারে। তুমি ঘুমোও। আমি জাগছি ইতিমধ্যে মংঘীরামের কাছ থেকে কেউ যদি আসে তোমাকে ডাকব কি?

—মংঘীরামের কাছ থেকে কেউ কোনদিনই আসবে না রঞ্জন। ওদের টাকা এত সস্তা নয় যে আমি চাইলেই দিয়ে দেবে ওরা। মংঘীরামের কাছ থেকে টাকা চেয়ে পাবো না। জোর করে আদায় করতে হবে।

রঞ্জন অবাক চোখে চেয়ে রইলো শবনমের মুখের দিকে। কি সুন্দর ফুলের মতো মেয়েটি। কিন্তু এর এই সৌন্দর্যের মধ্যেও অমন খুনের নেশা কোথায় কোন গোপনে ঘুমিয়েছিল? তাছাড়া এমন প্রখর বুদ্ধি, এমন ভয়ানক দুঃসাহস ওর কি করে হ'ল?

রঞ্জন বলল—তুমি নিশ্চিন্তে ঘুমোও শবনম। আমি তো আছি। তুমি ঠিকই বলেছ, আমাদের রাত জেগেই পাহারা দিতে হবে।

শবনম সেই খড়ের শয্যায় হাত পা ছড়িয়ে দিয়ে শুয়ে পড়ল। শোয়ামাত্রই ঘুম ঘুম ঘুম।

রঞ্জন নিদ্রিত শবনমের মুখের দিকে অপলকে চেয়ে রইলো। এই অনিন্দ্যসুন্দরী কিশোরীকে এই মহারণ্যে ফেলে রেখে ও কি করে ফিরে যাবে নিজের দেশে? শবনম ফুলনদেবী হবে, পাহাড় বনের রাণী হবে। কিন্তু এই সুন্দরী কিশোরীর সঙ্গে তার যে সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে, যে বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছে, যে মোহ জন্মেছে সেটাকে সে কাটিয়ে উঠবে কেমন করে? না না। শবনমকে সে ভুলতে পারবে না। আর ওকে ভুলতে না পারলে ওর লেখাপড়াতেও মন বসবে না, বড় হওয়ার স্বপ্নও বিঘ্নিত হবে। মনে শান্তি থাকবে না। তাই ওর মানসিক সুখ শান্তির জন্য শবনমকে ওর একান্ত প্রয়োজন। আর সেই জন্যেই ওকে আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে যে ভাবেই হোক বুঝিয়ে বাঝিয়ে ভুলিয়ে ভালিয়ে শবনমকে প্রকৃতিস্থ করে আবার

শহর সভ্যতার সংস্পর্শে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার।

রঞ্জন অনেকক্ষণ ধরে নিজের মনের সঙ্গে অনেক বোঝা-পড়া করে ঠিক করল কাল সকালেই ওরা ফিরে যাবে এখান থেকে। রঞ্জন শবনমকে নিয়ে ওদের বাড়িতেই গিয়ে উঠবে। শবনম থাকবে ওদেরই কাছে। দুজনে একসঙ্গে পড়াশুনা করবে। বড় হবে। যদি তারা আপত্তি করেন তাহলে শবনমকে নিয়ে রঞ্জন চলে যাবে অন্য কোথাও অন্য কোনখানে। মুসলমান থেকে হিন্দু হওয়ার অসুবিধা থাকলে ও হিন্দু থেকে মুসলমান হবে। পবিত্র ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়ে শবনমকে বিয়ে করে দুজনে সুখে থাকবে।

যেই না মনে হওয়া অমনি আশায় আনন্দে ও উত্তেজনায় বুক ভরে উঠল রঞ্জনের। এত সহজে যে জিনিসের মীমাংসা হয়ে যায় তার জন্য এত ভাবনা চিন্তার কোন প্রয়োজন ছিল কি? রঞ্জন একবার ঝুঁকে পড়ে দেখল শবনমকে। তারপর খুব আলতো করে ওর কপালে একটু হাত বুলিয়ে দিতেই চোখ মেলল শবনম। একবার ঝেড়ে উঠে বসেই বলল—কি হল রঞ্জন! ভয় পেলে?

—না।

—তাই ভালো। তারপর মৃদু হেসে বলল - হঠাৎ এত আদরের ব্যাপার কি?

— আমি তোমার বিষয়ে একটা সিদ্ধান্তে এসেছি।

— কি সিদ্ধান্ত বলো?

— তুমি এখন থেকে সারাজীবন আমার কাছেই থাকবে।

— বলো কি! এ তো অতি লোভনীয় প্রস্তাব। কিন্তু কি ভাবে?

— তুমি আমার সঙ্গে আমাদের বাড়িতে যাবে। আমি আমার মা বাবাকে অনুরোধ করব তোমাকে আমাদের পরিবারের মধ্যে রাখবার। যদি তাঁরা রাজি না হন তাহলে আমি তোমাদের ফ্ল্যাটে চলে যাব। আশা করি তোমার আব্বাজান তোমার জন্য যা কিছু

রেখে গেছেন তাতে আমাদের দুই বন্ধুর দিন স্বচ্ছন্দেই কেটে যাবে। তারপর আমরা মন দিয়ে লেখাপড়া শিখে বড় হবো এবং বড় হয়ে পবিত্র ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে আমি তোমাকে বিয়ে করব।

শবনম ঢেউয়ের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল রঞ্জনের ওপর। বলল—আরে! এতো সহজে মীমাংসা হয়ে গেল সব? খুব ভালো হয় তাহলে। সত্যি রঞ্জন! তোমার মতো বন্ধু পাওয়া আমার জীবনের মস্ত বড় একটা লাভ। তুমি বিশ্বাস করো, এই সামান্য পরিচয়েই তোমার প্রতি আমার একটা দুর্বলতা এসে গেছে। তবে আমাদের সম্পর্কটা স্থায়ী করার ব্যাপারে অ্যাডাল্ট হওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। ওটা এখনো হতে পারে।

—না। তাহলে আমাদের দুজনের অগ্রগতির পথ ব্যাহত হবে। বয়সের ব্যাপারটা বয়সে হওয়াই ঠিক। এখন আমাদের সম্পর্কটা হবে ঠিক ভাই বোনের মতো।

—যা তুমি বলবে।

—আমরা কাল সকালেই ফিরে যাই চলো এখান থেকে।

শবনম হঠাৎ কিরকম দপ করে জ্বলে উঠল। বলল—তার মানে তুমি মনগড়া কতকগুলো মিথ্যেকে সত্যি করে সাজিয়ে আমাকে ভোলাতে চাইছ? তুমি এত নীচ রঞ্জন? তুমি কি করে ভাবলে যে আমি আমার আব্বাজানের হত্যাকারীদের বদলা না নিয়ে ফিরে যাব? তাছাড়া এই মুহূর্তে আমরা আমাদের আদর্শচ্যুত হয়ে চলে গেলে এই পাহাড়িদের অবস্থাটা কি হবে তা একবার ভেবে দেখেছ? মংঘীরাম আর হিন্দোল সর্দারের লোকেরা বিদ্রোহী হওয়ার অপরাধে এদের পিঠের চামড়া ছাড়িয়ে নেবে তা জান? এই সহজ সরল নির্বোধ মানুষগুলোকে অসহায় ভাবে শত্রুর মুখে ঠেলে দিয়ে আমরা চলে যাবো? তুমি যাও রঞ্জন। কাল সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই এই এলাকা ছেড়ে চলে যাও তুমি। আমার কাজ আমাকে করতে দাও।

রঞ্জনের চোখ দুটো ছল ছলিয়ে উঠল। বলল—তুমি আমায় ভুল বুঝলে শবনম। তুমি কি করে ধারণা করলে আমি মিথ্যে কথা বলছি? তোমার ওপর আমার মোহ না থাকলে আমি কি এতটা সময় থাকতাম তোমার কাছে? আমি কি পারতাম না সেই গোবিন্দজীর মন্দিরে আমার নিজের ব্যবস্থাটা করে নিতে? শুধু তোমার অসহায়তার কথা ভেবেই তো আমি আমার নিরাপদ আশ্রয় ছেড়ে গুহাবাসী হলাম। আর তুমিই কি না আমাকে সন্দেহ করছ? শবনম! জেনে রেখো, আমি এক সদ্‌বংশ জাত ভদ্র পরিবারের ছেলে। এবং নেহাৎ বালকও নই! সত্যের জন্যে, ধর্মের জন্যে এবং তোমার জন্যে আমি জীবনও দিতে পারি।

শবনম মাথা নত করে বলল তুমি আমাকে ক্ষমা করো রঞ্জন। আমি তোমাকে ভুল বুঝেছিলাম। তবু তুমি নিজেই একবার ভেবে দেখো তুমি যে কথাটা বললে সেটা নিছক স্বার্থপরের মতো কিনা?

—কতকটা তাই। তবে এই বদলা নেওয়ার কাজটা পুলিশকে দিয়েও করানো যেত।

—যেত না। কিছু কিছু কাজের জন্য জনসাধারণকেও এগিয়ে আসতে হয়। পুলিশকে দিয়ে সব কাজ যদি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা যেত তাহলে এদেশে এত কড়াকড়ির মধ্যেও মংঘীরাম ও হিন্দোল সর্দারের অত্যাচার প্রাধান্য পেত না। এখানকার এই দুই প্রধান শত্রুর মোকাবিলা না করে আমরা ফিরতে পারি না রঞ্জন। এতে পাহাড়িদের প্রতি আমাদের বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে।

রঞ্জন বলল—হ্যাঁ। তুমি ঠিকই বলেছ। আমি আমাদের দিকটাই চিন্তা করেছিলাম কিন্তু এদের কথাটা ভাবিনি।

এমন সময় কয়েকজন পাহাড়ি ছুটে এসে বলল—দেবীজী! পাহাড়ের নীচের দিক থেকে কিছু লোক আমাদের এই দিকে আসছে। ওদের হাতে বন্দুক ভি আছে।

—ওরা কারা?

—মালুম নেহি। তবে মনে হচ্ছে পুলিশের লোক।

—ওরা কতজন আছে বলতে পারো?

—তা বিশ পঁচিশ জন তো হবেই।

রঞ্জন আর শবনম পরস্পরের মুখ চাওয়া চাওয়ি করল।

রঞ্জনের বুক ঢিপ ঢিপ করতে লাগল ভয়ে। কিন্তু শবনম বেপরোয়া। যেন কিছুই হয় নি এমনভাবে বলল—বুঝেছি। মংঘীরাম আমার সঙ্গে দোস্তি নয়, প্রতিদ্বন্দীতা করতে আসছে। তবে আমিও খোদা তালার নাম নিয়ে বলছি ওদের একটাকেও আমি ফিরে যেতে দেবো না। আমি জানি ওরা কারা। ওরা কখনোই পুলিশের লোক নয়।

পাহাড়িরা বলল—কিন্তু দেবী! একা আপনি লড়বেন কি করে ওদের সঙ্গে? ওরা বিশ পঁচিশ জন। আপনি একা। আমরা কেউ যুদ্ধ জানি না। বন্দুকের চেহারা দেখেছি। কিন্তু বন্দুক চালাবার কথা স্বপ্নেও ভাবিনি।

শবনম তখন রুখে দাঁড়িয়েছে।

আবার যেন এক প্রেতিনী ভর করল তার ওপর। বজ্রমুষ্ঠিতে বন্দুক ধরে বলল—ঠিক আছে। তোমরা একটু বাল বাচ্চা নিয়ে সাবধানে থেকো। পারো তো কাছে পিঠে কোন গুহা টুহা থাকলে লুকিয়ে পড়ো সেখানে। সন্ধ্যে হয়ে আসছে। আর দেরী কোর না। যাও। রঞ্জন তুমিও যাও ওদের সঙ্গে।

রঞ্জন শবনমের একটা হাত শক্ত করে টিপে ধরে বলল—তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে শবনম? একা তুমি অতগুলো লোকের সঙ্গে লড়বে কি করে? চলে এসো। ওরা এখুনি মেরে ফেলবে তোমাকে।

শবনম বন্দুকে টোটা পুরে বলল—রঞ্জন! আমার জন্যে চিন্তা কোর না। শুধু জেনে রেখো যে মানুষ মরতে চায় তার মরণ হয় না। তাকে মারতে কেউ পারে না। মরে তারাই যারা বাঁচবার

জন্যে হাঁক পাঁক করে। তবে হ্যাঁ, এ কাজে ঝুঁকি আছে। তাই তোমাকে সঙ্গে নিচ্ছি না। তুমি ওদের সঙ্গে যাও।

—না। তোমাকে আমি ছাড়ব না। মরলে দুজনেই একসঙ্গে মরব।

এমন সময় হিংলাজ সর্দার এগিয়ে এসে বলল—এ লড়াই বাঁচার লড়াই। আমরাও তোমাদের একা ছাড়ব না। তোমাদের এই দুই নাবালক ছেলেমেয়েকে বিপদের মুখে ঠেলে দিয়ে আমরা কি চুপচাপ বসে থাকব ভেবেছ? তোমরা যদি আমাদের জন্য জীবন বিপন্ন করতে পারো তাহলে আমরাই বা নিজেদের জন্য লড়তে পিছবো কেন? শুধু ছোট ছেলে মেয়েগুলোকে অন্য কোথাও সরিয়ে দিয়ে এসো আমরা সবাই মিলে ঝাঁপিয়ে পড়ি।

আর একজন বলল—ঠিক। সর্দার যা বলেছে তা ঠিক। অনেক মার খেয়েছি আমরা। আর মার খাওয়া নয়। এবার আমরা পাল্টা মার দেবো। কেউ পালাবো না এখান থেকে। মরলে সবাই মরব একসঙ্গে। আজ রাতের অন্ধকারে হয় ওরা মরবে নয়তো আমরা শেষ হয়ে যাব। আমরা জানি ওরা কি করবে। ওরা আমাদের ঘরে ঘরে আগুন ধরিয়ে দেবে। দিক। আমাদের একজনও যদি বাঁচি তাহলে ঐ আগুনকে দাবানল করে ছড়িয়ে দেবো চারিদিকে।

কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তীর কাঁড় বল্লম কুড়ুল হাতে হাতে চলে চলে এসো সব।

শবনম বন্দুকের নল শূন্যে উঁচিয়ে একটা শব্দ করল। আর সেই শব্দের সঙ্গে হৈ হৈ করে উঠল আরণ্যকরা।

সবাই সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠল—জয় দেবী ভয়ংকরীর জয়। আমাদের অরণ্যদেবী অমর রহে।

রঞ্জন বন্দুক চালাতে না পারলেও সঙ্গে নিয়েছে একটা।

অদূরে হিন্দোল কেল্লার মাথায় একটা মশালও জ্বলতে দেখা গেল। সেই মশাল নেড়ে কে যেন কিসের ইঙ্গিত দিচ্ছে। তবে কি

বন্দুকধারী ঐ যোদ্ধারা মংঘীরামের লোক নয় ? এরা কি হিন্দোল সর্দারেরই সৈন্য বাহিনী ?

সব যেন কিরকম জট পাকিয়ে যাচ্ছে।

পাহাড়ের নীচে আর পাহাড়ের চূড়ায় এই দুই ঘোড়েল শয়তানকে জব্দ করা বড়ই কঠিন ব্যাপার। তবুও সাহসে বুক বেঁধে ওরা এগিয়ে চলল সন্তর্পণে। পা টিপে টিপে। বাঘিনি যেভাবে তার শিকারের দিকে এগোয় ঠিক সেইভাবে শবনমও এগিয়ে চলল ধীরে ধীরে।

এক জায়গায় বড় একটি পাথরের আড়ালে এসে থামল শবনম।

ঐ তো দূরে পাহাড়ের ঢালে দেখা যাচ্ছে লোকগুলোকে। দেখে মনে হচ্ছে ওরা পুলিশেরই লোক। কিন্তু মংঘীরাম এত তাড়াতাড়ি পুলিশকে ফিল্ডে নামাবে কি করে ? এরা নকল পুলিশ নয় তো ? তাছাড়া হিন্দোল কেল্লার মাথায় ঐ মশালের আলো কিসের বার্তা বহন করছে ? কোন কিছুই বোঝা যাচ্ছে না এই ভয়ানক পরিস্থিতিতে।

শবনম সকলকে বলল—তোমরা যে যার সুবিধা মতো বড়বড় গাছের ডালে পালায় লুকিয়ে থাকো। ওদিক থেকে বাধা না পেলে বা আমি না বললে কাউকে আক্রমণ করো না।

নীচের লোকগুলি বন্দুক উঁচিয়ে এমনভাবে এগিয়ে আসছে যে মনে হচ্ছে রাতের অন্ধকার না হলে ওরা ঝাঁপিয়ে পড়বে না।

কিন্তু মুশকিলটা হ'ল এই যে, এই সন্ধ্যার ধূসর যবনিকায় ওরা ক্রমশ অস্পষ্ট হয়ে আসছে। ওদের ছায়া ছায়া কালো কালো মূর্তিগুলো এক সময় আর দেখাই গেল না। তবে এটুকু বেশ বুঝতে পারা গেল যে ওরা আসছে—আসছে—আসছে।

ধীরে ধীরে অতি সন্তর্পণে শিকারী বাঘের মতো থাবা উঁচিয়ে এগিয়ে আসছে ওরা।

॥ চার ॥

শবনম কিছুতেই ভেবে পেল না এই মুহূর্তে তার করণীয় কি? এদিকে পাহাড়িরাও আসন্ন যুদ্ধের মোকাবিলা করবার জন্য দারুণভাবে মরিয়া। আসলে সুপ্ত চেতনা জাগরিত হলে যা হয় আর কি? তবে ওরা শুধু আদেশের অপেক্ষায় আছে। কতক্ষণে ওদের দেবী একবার শুধু বলবে 'মারো'। কিন্তু শবনম তো এখনি সে কথা বলতে পারে না। কেননা যদি এরা সত্যিই পুলিশের লোক হয়। ঐ ভয়াবহ ট্রেন দুর্ঘটনার পর পুলিশও তো চুপ করে বসে থাকবে না। তারাও তন্ন তন্ন করে চারদিক থেকে লুটের মাল উদ্ধারের চেষ্টা করবে। হয়তো ওরা সেই সূত্রেই এই গিরি অরণ্যে অভিযান চালিয়েছে।

রঞ্জন শবনমের খুব কাছেই ছিল। বলল—কিভাবে কি করবে ঠিক করলে কিছু?

—না।

—তোমার কি মনে হয় ওরা সত্যিকারের পুলিশ?

—ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না।

—তাহলে?

—ওরা আর একটু কাছে আসুক।

—আমার কিন্তু মন বলছে ওরা পুলিশের লোক নয়।

—তোমার এই রকম মনে হওয়ার কারণ?

—কেন না পুলিশের লোক হলে এই অন্ধকারে ওরা চুপি চুপি চোরের মতো আসত না। প্রকাশ্য দিবালোকেই আসত।

—ঠিক। তবে এমনও তো হতে পারে ওরা অতর্কিতে আক্রমণ করবে বলেই এইভাবে আসছে।

—মানলাম। তাহলে হিন্দোল সর্দারের কেল্লা থেকে মশালের আলোর সংকেত কাদের দৃষ্টি ওরা আকর্ষণ করছে ?

—সেটা আর একটু পরেই জানা যাবে। ঐ শোনো বুটের শব্দ।

হ্যাঁ। সত্যিই তো। বেশ ভারী পায়ের মসমস শব্দ কাছের দিকে এগিয়ে আসছে ক্রমশ।

শবনম হঠাৎ রঞ্জনকে কিছু না বলেই ওর গুপ্তস্থান থেকে বেরিয়ে গিয়ে আর একটি বড় পাথরের আড়ালে দাঁড়িয়ে রাইফেল তাগ করে বলল—হল্ট।

পায়ের শব্দ থেমে গেল।

শবনম বলল—তুম সব কৌন হো ?

—হাম পুলিশকা আদমি। তুম ?

—ম্যায় ইস পাহাড় জঙ্গলকা রাণী হুঁ।

—সমঝ গিয়া। তুম ডাকু সর্দারকা আদমি। আভি বন্দুক ফিক দো। নেহি তো মুসকিল হো যায়ে গা।

শবনম এবার আত্মপ্রকাশ করে বলল—আমি এই জঙ্গলের রাণী। যদিও কোন রাজা নেই। তবুও আমি রানী। এরা আমার প্রজা। এখানকার সব কিছুর ওপরই আধিপত্য আছে আমার। তবে হিন্দোল সর্দারের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই। অবশ্য একেবারে যে নেই তা নয়। দুশমনির সম্পর্কটা আছে! তা আপনারা কি হিন্দোল সর্দারের খোঁজে যাচ্ছেন ?

—হ্যাঁ। কিন্তু তুমি তো বেশ ভালো বাংলা বলতে পারো দেখছি। কি নাম তোমার ?

—আমার নাম শবনম। আমি উর্দুতে পড়াশুনা করলেও কলকাতার মেয়ে। বাংলা ভালোই জানি। আপনি ?

—আমিও বাংলা জানি।

—কিন্তু আপনি যে ডাকু সর্দারের খোঁজে চলেছেন আপনি কি

জানেন ঐ কেল্লার কাছাকাছি গেলেই অতর্কিতে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি কেল্লার ভেতর থেকে ছুটে আসে?

—জানি।

রাইফেল তাগ করে বলল হল্ট……পৃঃ ৮২

—তাহলে?

—আমরা জেনেশুনেই এসেছি! আমাদের একজন লোক ছদ্মবেশে ওদের দলে আছে। সে-ই ডাকিয়েছে আমাদের। ঐ

দেখো আলোর সংকেত।

শবনম দেখল বেশ কিছু পুলিশের লোক রাইফেল স্টেনগান ইত্যাদি নিয়ে জড় হয়েছে সেখানে। অদূরে কেল্লার মাথা থেকে আলোর সংকেতও দেখা যাচ্ছে।

রঞ্জনও কখন যেন চুপি চুপি এসে দাঁড়িয়েছে ওদের পাশে। অন্যান্য পাহাড়িরাও ঘিরে আছে চারদিক।

শবনম বলল—আপনি নিশ্চয়ই ইন্সপেক্টর ?

—হ্যাঁ। আমিই ইন্সপেক্টর জেনারেল বলতে পারো। তবে আসল নয়। নকল। আর এরা আমার দলের লোক।

শবনম সবিস্ময়ে বলল—সেকি! তাহলে কে আপনি ?

—আমার নাম লালচাঁদ রায়। বাঙালি। চিরকাল মধ্যপ্রদেশের খাণ্ডোয়াতে কাটিয়েছি। ঐ ডাকাত সর্দার আমার সঙ্গে কোন একটা ব্যাপারে বেইমানি করেছে। তাই সেই বেইমানির বদলা নিতেই এসেছি আমি। আমার একজন লোক ওদের দলে আছে। ঐ আলোর সংকেত সেই দেখাচ্ছে।

শবনম উৎসাহিত হয়ে বলল—কি নাম বলুন তো ?

—তুমি চিনবে না! ওর নাম ভীমা গাড়োয়াল।

—ওর ভরসায় আপনারা এমন ঝুঁকি নিয়ে এসেছেন ? কিন্তু ও যদি আপনাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে ?

—গাড়োয়ালরা কখনো বিশ্বাসঘাতকতা করে না।

—কে বললে ? ঐ গাড়োয়াল হিন্দোল সর্দারের সঙ্গে তার বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে বিশ্বাসঘাতকতা করছে না কি ?

লালচাঁদ এবার চমকে উঠলেন। বললেন—কে তুমি! এই অল্প বয়সে এমন প্রখর বুদ্ধি রাখো ?

—আমি যে কে তা আমিই জানি না। এখন আমি এই অরণ্যের দেবী। এই যে দেখছেন সহজ সরল পাহাড়িরা, ঐ অত্যাচারীর অত্যাচারে ওরা জর্জরিত। ঐ কেল্লা পাহাড়ে

হিন্দোল আর নীচের অরণ্যে মংঘীরাম এই দুই অত্যাচারীর অত্যাচার ও শোষণে এরা আধমরা হয়ে আছে। এরা এক ভয়াবহ ট্রেণ দুর্ঘটনা ঘটিয়ে বহু মানুষের জীবনহানি ঘটিয়েছে। সেই দুর্ঘটনায় আমি আমার আব্বাজানকে হারিয়েছি! আরো কতজন কতজনকে যে হারিয়েছে তার ঠিক নেই। তাই আমিও চাইছি ঐ শয়তানের কেল্লা দখল করে ওর মুণ্ডু হাতে নিয়ে মা কালীর মতো নাচতে।

লালচাঁদের চোখ দুটো জ্বলে উঠল। বললেন—তোমার আর আমার পথ একই। কিন্তু এই জঙ্গলে হত্যার নেশায় মেতে ডাকাত রানী সেজে তুমি কতক্ষণ লড়বে? একমাত্র তোমার হাতে ছাড়া আর কারো হাতেই তো বন্দুক দেখছি না।

শবনম বলল—এই একটিমাত্র বন্দুকেই আমি এ পর্যন্ত অনেকগুলো প্রাণ ছিনিয়ে নিয়েছি। হিন্দোল সর্দারের দলের অনেক লোককে একা আমিই খতম করেছি এই বন্দুক দিয়ে।

—তাই নাকি? কিন্তু এটা কি করে সম্ভব হ'ল?

—আমার আব্বাজান মিলিটারীর লোক ছিলেন। উনি আমায় সব কিছু শিখিয়ে দিয়ে গেছেন।

লালচাঁদ দলের লোকেদের বললেন—এই মেয়েটিকে দেখে তোমরা শেখো প্রতিশোধ কি করে নিতে হয়। একে দিয়েই তোমরা অনুভব করো মানুষ মরিয়া হলে কি না করতে পারে। তারপর শবনমকে বললেন, তুমি যদি সত্যিই ঐ দুরাত্মার প্রতিশোধ নিতে চাও তাহলে আমার সঙ্গে হাত মেলাতে পারো। আমি তোমাকে সব রকমে সাহায্য করব।

—সত্যি বলছেন?

—তোমাকে মিথ্যে বলে লাভ? তোমার চোখে যে আগুন আমি দেখেছি, তোমার মনের মধ্যে যে বারুদের স্তূপ আমি আবিষ্কার করেছি তাতে বেশ বুঝতে পারছি আর এক নতুন পুতলিবাঈ জন্ম নিয়েছে এখানে। কাজেই আমার স্বার্থের জন্যে দলের প্রয়োজনের

জন্যে, তোমাকে আমার একান্ত ভাবে প্রয়োজন।

—আমি রাজি।

ওদিকে হিন্দোল কেল্লার মাথার ওপর আলোর সংকেত আবার দুলে উঠল।

—ঐ দেখো! সুবর্ণ সুযোগ। আমি আমার বদলা নিতে চলেছি। তুমিও তোমার পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিতে চলেছ। গো-অ্যাহেড।

শবনম এবার রঞ্জনের দুটি হাত শক্ত করে ধরে বলল—রঞ্জন! তুমি থাকো। আমি যাই। ঐ কেল্লা বিজয় করে কাল সকালের আগেই আমি ফিরে আসব। আমি না আসা পর্যন্ত একটু একা থাকো। আমাদের পাতার ঘরে নির্ভয়ে বিশ্রাম করো তুমি।

হিংলাজ সর্দার এবং তার দলের লোকেরা বলল—ঐ কেল্লা যদি সত্যিই দখল হয় তাহলে চলো না কেন আমরাও সবাই মিলে দল বেঁধে যাই। শত্রুর শেষ একদিনেই হয়ে যাক।

লালচাঁদ বললেন—না। সবাই গেলে ওরা আমার চাতুরি ধরে ফেলবে। হিন্দোল আমার চিরশত্রু। আমি ছদ্মবেশে এসেছি। ছদ্মবেশেই ঢুকব। ওর অত্যাচারে ওর দলের অনেক লোকই দল ত্যাগ করেছে।

শবনম বলল—বাকি যারা ছিল তাদের ভেতর থেকেও কয়েকজনকে আমি খসিয়ে দিয়েছি।

—বেশ করেছ। এখন আর এক মুহূর্ত সময় নষ্ট নয়। চল সবাই সতর্ক হয়ে যাই।

রঞ্জনের এ ব্যাপারে খুব একটা সায় ছিল না। তাই বলল—শবনমের কি না গেলেই নয়?

শবনম বলল—ভয় নেই, আমি আবার ফিরে আসব। হিন্দোল সর্দারের সাধ্য কি যে আমায় ধরে রাখে? তাছাড়া এখন আমরা দলে অনেক ভারি।

রঞ্জনের চোখ দুটি ছলছলিয়ে উঠল। বলল—খোদা মেহেরবান। তুমি জয়যুক্ত হয়ে ফিরে এসো শবনম।

সেই আলোর সংকেত ধরে ওরা সবাই পা টিপে টিপে দুর্গম পথে হিন্দোল কেল্লার দিকে এগোতে থাকল। আলোর সংকেত থেমে গেছে। তবু ওরা এগিয়ে চলল। এইভাবে ছল চাতুরি না করে ঐ কেল্লায় ঢোকবার কোন পথই তো জানা নেই।

যেতে যেতে লালচাঁদ বললেন—একবার শুধু ভেতরে ঢুকি। তারপর আজই রাতের অন্ধকারে তোমার বুক চিরে আমি রক্তপান করব ঘোড়েল শয়তান। তোমার বেইমানির বদলা আমি নেবোই।

ওরা ধীরে ধীরে এগোতে থাকল।

বন্দুক উঁচিয়ে নিঃশব্দে কেল্লার কাছাকাছি যেই না গেছে ওরা অমনি হঠাৎ রাতের অন্ধকার বিদীর্ণ করে শব্দ হল—ডিস্যুম, ডিস্যুম, ডিস্যুম। ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি দুর্গ প্রাকার থেকে ছিটকে এসে ঝাঁঝরা করে দিল ওদের। এক লহমায় কয়েকটি তাজা প্রাণ লুটিয়ে পড়ল মাটিতে।

কেল্লার মাথায় বুরুজের গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ভীমা গাড়োয়াল দাঁড়িয়েই রইল একভাবে। ওর হাত থেকে খসে পড়েছে মশালের আলোটা। ধড় থেকে মুণ্ডুটাও ছিটকে পড়েছে এক কোণে। ভীমার মাথাটা একজন এসে কুড়িয়ে নিয়ে বুরুজের লৌহ শলাকায় গেঁথে রাখল। আর যে অস্ত্রের ঘায়ে ওর ধড় থেকে বিচ্যুত হয়েছিল মুণ্ডুটা সেই অস্ত্রের গায়ে লেগে থাকা রক্তের দাগ নিয়ে নিজের কপালে একটা টিপ্পা দিলেন সর্দার। সর্দারের রক্তচক্ষুতে তখন আগুন জ্বলছে। কেল্লার মাথা থেকেই চিৎকার করে উঠলেন সর্দার—আগ লাগা দো বস্তী মে। আউর ফুলন দেবী বননেবালী উস লেড়কিকো পাকড়কে লে আও। যাও। আভি চলা যাও সব।

চোখের পলকে পাঁচজন অশ্বারোহী মশাল ও বন্দুক নিয়ে সেই

অন্ধকার ভেদ করে ছুটে চলল পাহাড়ি বস্তীর দিকে। কিছুটা পথ যাবার পর পাঁচজন পাঁচ দিক থেকে ঘিরে ফেলল বস্তীটাকে। কেননা সর্দারের হুকুম অমান্য করার সাহস ওদের নেই। অথচ সুন্দরী কিশোরী ডাকু শবনমের বেপরোয়া অব্যর্থ গুলি চালানোর কাহিনীও শোনা এবং জানা আছে। তাই সব দিক থেকে আক্রমণের জন্যই ওরা এই ব্যবস্থাটা নিল।

একেবারেই অতর্কিত আক্রমণ।

যুদ্ধ না করা সরল প্রাণ পাহাড়িরা তখন একেবারেই নিশ্চিন্ত ছিল। বরং হিন্দোল কেল্লার দিক থেকে ছুটে আসা গুলির শব্দকে ওরা নকল পুলিশ বাহিনীর আক্রমণ ভেবে আনন্দে উল্লাস করছিল। এমন সময় হঠাৎ হতচকিত হয়ে ওরা দেখল রাতের অন্ধকারে ওদের পাতার ঘরগুলো দাউ দাউ করে জ্বলছে। কোন কিছু ঠিক মতো বুঝে ওঠার আগেই ওরা দেখল ওদের ক্ষুদ্র বস্তীতে যেন বহ্ন্যুৎসব শুরু হয়ে গেছে। ওরা হতভম্ব হয়ে দেখতে লাগল কয়েকজন ডাকাত ঘোড়ার পিঠে চেপে এদিক সেদিকে ছুটোছুটি করছে।

তির, কাঁড়, টাঙি, বল্লম, শাবল, কুড়ুল নিয়ে যারা ওদের বাধা দিতে গেল তারা মরল। যারা প্রাণের ভয়ে লুকলো তারা বাঁচল।

ওদেরই ভেতর থেকে একজন ঘোড়ার পিঠে বসেই হঠাৎ চোখের সামনে হিংলাজ সর্দারকে দেখতে পেয়ে তার বুকে বন্দুকের নল ঠেকিয়ে বলল—ও লেড়কি কাঁহা হ্যায় ?

হিংলাজ সর্দার তখন ছুটতে গিয়ে মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ে গেছে। সেই অবস্থাতেই তাকে উঠতে না দিয়ে ঘোড়ায় বসা লোকটি রক্তচক্ষুতে বলল—বোল্ জলদি ও লেড়কি কাঁহা হ্যায় ?

অন্য ডাকাতরা তখন বন্দুক তাগ করে কয়েকজন পাহাড়িকে ধরে এনেছে সেখানে। তারা বলল—তুম সবকো সর্দারকা পাশ জানা হোগা।

পাহাড়িরা বলল—দোহাই। আমাদের প্রাণে মেরো না।

গরীব মানুষ আমরা। এখন থেকে তোমরা যা বলবে তাই শুনব। আর কখনো বিদ্রোহী হব না।

—মারো চপ্পল বদমাসকো। জলদি চল সর্দারকে পাস।

আর এক ডাকাত পাহাড়ি বস্তীর কয়েকজন রমণীকে জোর করে টেনে আনছে।

হিংলাজ সর্দার মরিয়া হয়ে বন্দুকের নলটা শক্ত করে ধরে হেঁচকা টান দিল একটা। কিন্তু তাতে অবশ্য লাভ হ'ল না কিছু। ডাকাতের গায়ে প্রচন্ড শক্তি। সে যেমন বসে ছিল তেমনিই রইল। শুধু হিংলাজ তার বুকের ওপর থেকে কোন রকমে নলটা নীচের মাটিতে নামাতে পারল।

ঘোড় সওয়ার ভয়ংকর রেগে আবার বলল—ও লেড়কি কাঁহা হ্যায় ?

—নেহি বতাউঙ্গা।

—তো ঠিক হ্যায়। আপনা ভগবান কো ইয়াদ করো। রাম-দো-তিন···।

ডিস্যুম।

পাহাড় ও বনভূমি কাঁপিয়ে একটা বন্দুকের গুলির শব্দ। আর সেই শব্দের সঙ্গে সঙ্গেই দেখা গেল ঘোড়ার পিঠে বসে থাকা ডাকাতের মাথাটা তুবড়ির মতো উড়ে গেল।

সবাই হতচকিত। এ কি যাদুরে বাবা। অন্যান্য ডাকাতরাও তখন ভয়ে থর থর করে কাঁপছে।

এমন সময় সেই অন্ধকারে হঠাৎই শবনমের গলা শোনা গেল—বন্দুক ফিক দো শয়তান ডাকু।

ডাকুদের আর বন্দুক ফিকতে হ'ল না। পাহাড়িরাই আবার তাদের নেত্রীর কন্ঠস্বর শনে ঝপাঝপ লাফ মেরে কেড়ে নিল বন্দুকগুলো। দিশেহারা ডাকাতরা তখন প্রাণভয়ে পালাতে গেল। কিন্তু সেই অন্ধকারে গাছের ডালে ধাক্কা খেয়ে জখম হয়ে দুজন

পড়ে গেল মাটিতে। আর বাকি দুজন শবনমের গুলিতে নিহত হয়ে ছুটন্ত ঘোড়ার পিঠ থেকে টিপ ঢাপ পড়ল।

হিংলাজ সর্দার নিজেই পাকড়ালো একজন ডাকাতকে।

অন্য একজনকে বাকিরা।

আর ঘোড়াগুলোর সব কটাই ধরে ফেলল সকলে মিলে।

ঘোড়াগুলোকে একটা গাছের গুঁড়ির সঙ্গে শক্ত করে বেঁধে ধৃত ডাকাত দুটিকে বেঁধে ফেলল ওরা।

ভয়ে কথা বলতে পারছে না ডাকাতরা! কেননা ওরা বুঝতেই পারছে কি ভয়ঙ্কর পরিণতিটাই না ঘটতে চলেছে এবার। এই কিশোরী ডাকু ওদের সর্দারের চেয়েও মারাত্মক। ওরা ভয়ে ভয়ে দেখল একটা বাঘিনী যেন একটা ছুরি হাতে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে ওদের দিকে। ছুরির ফলাটা ওদের চোখের দিকে তাগ্ করা।

বাঘিনী এগিয়ে আসছে। ঐ অনন্ত সৌন্দর্যের মধ্যে এইটুকু একটা মেয়ের সে কি হিংস্রী রূপ। ওরা চিৎকার করে উঠল—নেহি নেহি নেহি।

—বল শয়তানরা এখানে তোরা কি করতে এসেছিলি? তোরা কি জানতিস না এই অরণ্যে আমি ডাকিনি মন্ত্র নিয়ে অরণ্যকে পাহারা দিচ্ছি? এর আগে তোদের অন্যান্য সঙ্গীদের আমি কি ভাবে হত্যা করেছি সে কথা কি ভুলে গেছিস?

—ভুলিনি দেবী।

—তাহলে কোন সাহসে আবার এসেছিলি এখানে? কেন এদের ধরে নিয়ে যাচ্ছিলি? কেন এখানকার মেয়েদের গায়ে হাত দিয়েছিলি? বল? কেন এ কাজ করতে এসেছিলি?

—সর্দারের হুকুমে।

—তোদের সর্দারের ওপর তো দেখছি দারুণ ভয় তোদের। কিন্তু আমাকে তোরা ভয় পাস না?

ওরা কাঁপতে কাঁপতে বলল—হ্যাঁ হ্যাঁ পাই।

—তাহলে কোন সাহসে এসেছিলি আমার ঘরে আগুন দিতে? এক লহমায় কি ভয়ানক কাণ্ডটা করে ফেলেছিস তোরা তা জানিস? এত দুঃসাহস তোদের কি করে হ'ল?

—আমাদের এবারের মতো ক্ষমা করুন দেবী। আমরা কথা দিচ্ছি আর কখনো আপনার সঙ্গে লাগতে আসব না। আমরা দস্যুবৃত্তি ছেড়ে দেবো। আপনার গোলাম হয়ে থাকব আমরা।

—এই রকম কথা তো আরো একজন দিয়েছিল। কিন্তু তাকে ক্ষমা করার পরও সে আমাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।

—কে সে?

—তার নাম মুখে আনতেও ঘৃণা হয়।

—না বললে আমরা কি করে বুঝব বলুন?

—ওর নাম 'থুঃ'।

হিংলাজ সর্দার বলল—ঐ বিশ্বাসঘাতকের নাম বিক্রমজিৎ।

—বিক্রমজিৎ! কিন্তু সে তো এখন আমাদের দলে নেই। সে তো ফেরার। দলত্যাগী।

—তোমরা মিথ্যে কথা বলছ। সেই বিশ্বাসঘাতক এখান থেকে ছাড়া পেয়েই তোমাদের কেল্লায় ফিরে যায়। সে শঠ। প্রবঞ্চক।

—হতে পারে। আপনাদের এখান থেকে ছাড়া পেয়ে সে পালিয়েছিল ঠিকই। তবে আমাদের দুর্গে সে ফিরে যায় নি। দুর্গের প্রহরীদের সে সর্তক করে দিয়ে বলেছিল, আমাদের অত্যাচার আর অনাচারের ফল নাকি আমরা হাতে নাতেই পাবো এবার। আমরা যেন হিন্দোল কেল্লা ছেড়ে এখুনি পালাই। নয়তো শিগগিরই প্রাণে মরব। কেননা এক কিশোরীর শরীরে এখানকার জাগ্রতা অরণ্যদেবী ভর করেছেন। তিনি অতি নিষ্ঠুরা। এই বলে সে দ্রুত অন্য পথে পালিয়ে যায়। সর্দার তখন কেল্লায় ছিলেন না। তাই তাকে মৃত্যুদন্ড আমরা দিতে পারিনি কেউ।

শবনম বলল—পালিয়ে সে কোথায় যেতে পারে? সে তো আমার কাছেই আসতে পারত?

—পালিয়ে সে একটি জায়গাতেই যেতে পারে সেটি হ'ল শহরের পুলিশ চৌকিতে।

—কিন্তু সেখানে গেলে তো অ্যারেষ্ট হয়ে যাবে সে।

—হবে। তার চোখে মুখে আমরা তীব্র অনুশোচনা এবং কঠিন সংকল্প দেখেছি। আমরা বুঝেছি মরতে সে আর একটুও ভয় পায় না। সর্দার তাকে দেখা মাত্র গুলির নির্দেশ দিয়েছেন। আমাদের একজন লোক সব সময় খুঁজে বেড়াচ্ছে তাকে।

লালচাঁদ ও তাঁর সাতজন যোদ্ধা তখন শবনমের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। দুর্গের ভেতর থেকে গুলি ছিটকে আসার সঙ্গে সঙ্গেই যারা ছোট বড় পাথরের আড়ালে কোন রকমে লুকিয়ে পড়ে প্রাণটা বাঁচাতে পেরেছে একমাত্র তারাই ফিরে এসেছে এখানে। লালচাঁদ পাকা লোক। তবুও তিনি ভাবতে পারেন নি এমন একটা কান্ড আচমকা ঘটে যাবে বলে। তবে শবনমের সর্তক বাণীর জন্য তিনি একটু সাবধান হয়ে গিয়েছিলেন তাই রক্ষে। গুলির শব্দ শোনার সঙ্গে সঙ্গেই শবনমকে জড়িয়ে ধরে বড় একটি পাথরের আড়ালে লুকিয়ে পড়েন। তারপর আর না এগিয়ে ধীরে ধীরে এক পা এক পা করে পিছু হটতে থাকেন। দলের লোকেদের বলেন যারা বেঁচে আছো তারা লুকিয়ে থাকো। আর একদম এগিও না। এগোলেই মরণ। কেননা ওরা দুর্গের আড়ালে আছে। আমরা আছি প্রকাশ্যে। আমরা গুলি ছুঁড়লে ওদের গায়ে লাগবে না। কিন্তু ওরা গুলি ছুঁড়লে আমরা সবাই মরব।

অতএব লালচাঁদ ব্যর্থ হয়েই ফিরে এসেছেন।

ধৃত লোক দুটির দিকে তাকিয়ে লালচাঁদ বললেন—আমাকে চিনতে পারো চেৎ সিং আর কালুরাম?

—লালবাবু!

—হ্যাঁ। আমি মরিনি। আমি এখনো জিন্দা আছি। ঐ শয়তান সর্দার আমার চরম সর্বনাশ করেছে। ওর বদলা নেবো বলেই আমি এসেছি। ভীমা গাড়োয়াল বিক্রমকে দিয়েই আমার কাছে খবর পাঠায়। সে এখন আমারই এক গোপন ঘাঁটিতে লুকিয়ে আছে। তিন দিনের মধ্যে আমার দিক থেকে কোন খবর না গেলে সে ফোনে পুলিশকে জানাবে।

—কিন্তু ভীমাকে তো সর্দার খতম করে দিয়েছে।

—সর্দার টের পেল কি করে যে ভীমা আমার হয়ে কাজ করছে?

—সর্দারের অজানা কিছু আছে কি? বাতাস ওর কানে কানে সব কথা বলে দেয়।

—যাক। এখন তোদের জন্যে আমরা কি শাস্তির ব্যবস্থা করতে পারি বল?

—আমাদের এবারের মতো ক্ষমা করো লালবাবু।

—তোদের ক্ষমা করব আমি? আমার সর্বনাশের সময় তোরা তো কেউ হাত গুটিয়ে বসে থাকিস নি। আমার চোখের সামনে আমার ছেলেকে তোরা গুলি করে মেরেছিস। আমার বউ। তাকে যে তোরা কোথায় নিয়ে গেছিস তার খোঁজ আজও পাইনি। ঐ হিন্দোল কেল্লার ভেতরে তাকে কি আমি আবার ফিরে পেতে পারি?

—না। সর্দার তাকে গুলি করে মেরেছে।

—তার অপরাধ?

—কোন অপরাধ নেই। তবে সর্দার বেশিদিন কাউকে বেঁচে থাকতে দেন না।

—তাহলে এর পরেও কি করে তোরা বলিস তোদের ক্ষমা করতে? তোদের শক্তিতেই তো ওর শক্তি। ডাক এবার তোদের ভগবানকে। এক—দুই—তিন—।

চিৎকার করে উঠল শবনম—না। আপনি ওদের মারবেন না। ওদের শাস্তি আমি দেবো। এটা আমার এলাকা। ওরা যেমন এই

পাহাড়ের বুক থেকে নিভৃত শান্তির ঘরগুলো পুড়িয়ে ছারখার করে দিয়েছে। অসহায় শিশু, গরু, ছাগল, যেমন অসহায় ভাবে পুড়ে মরেছে, তেমনি ওদেরকেও পুড়ে মরতে হবে তিল তিল করে। আমি ওদের জীবন্ত অগ্নিতে আহুতি দেবো। রঞ্জন! তুমি ওদের চিতা সাজাও। হাত পা বেঁধে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে ওদের ফেলে দিয়ে পুড়িয়ে মারব আমি। রঞ্জন!

কিন্তু কোথায় রঞ্জন!

শবনম চিৎকার করে ডাকল—রঞ্জন!

কোন সাড়া নেই। শব্দ নেই। ডাকের পর ডাক। তবু কোন প্রত্যুত্তর নেই। শুধু ওর দীপ্ত কণ্ঠস্বর পাহাড়ে পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে ফিরতে লাগল রঞ্জন! রঞ্জন! রঞ্জন! তুমি কোথায়? কোথায়? কোথায়?

উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠল সকলে। তাই তো! গেল কোথায় ছেলেটা? খোঁজ খোঁজ। সবাই এতক্ষণ এই ধৃতদের নিয়ে আর প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে বেসামাল হয়ে পড়েছিল। কে কার খোঁজ রাখে তখন। বস্তীর আগুনের হলকায় সবাই আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিল।

শবনমের হঠাৎই তখন মনে হ'ল সেই ভয়ানক কথাটা। বলল—ও আমাদের পাতার ঘরে বিশ্রাম নিচ্ছিল না তো?

হিংলাজ সর্দার বলল—হ্যাঁ মা! ওকে তো আমরা ওখানেই থাকতে দেখেছি।

—হয়তো বেচারা ঘুমিয়ে পড়েছিল। কিন্তু সেই পাতার ঘর? সে ঘর কি আস্ত আছে?

—কি জানি?

দুজন লোককে ধৃতদের পাহারায় রেখে সবাই ছুটল সেই পাতার ঘরের দিকে। কিন্তু না। সেখানে ঘরের চিহ্নও কোথাও নেই। নিভু নিভু আগুনের ক্ষীণ স্ফুলিংগ তখন ধিকি ধিকি জ্বলছে। তাই দেখে সেই কঠিন পাষাণের বুকে আছড়ে পড়ল শবনম—রঞ্জন!

আমাকে ক্ষমা করো বন্ধু। তুমিই আমার জীবন দান করলে অথচ আমারই জেদের জন্যে আজ তোমাকে এই ভাবে পুড়ে মরতে হ'ল। তবে আল্লা কসম। আমি পবিত্র কোরাণ শরীফের নামে শপথ নিয়ে বলছি, আল্লার নামে শপথ নিয়ে বলছি আমার প্রতিশোধ নেওয়ার পালা শেষ হলে আমিও জ্বলন্ত অগ্নিকুন্ডে আমার আত্মাহুতি দেবো। আমার জন্যে যে কষ্ট তুমি পেয়েছ সেই কষ্টের ভাগ আমিও সমান ভাবে ভাগ করে নেবো। তোমার এই মর্মান্তিক মৃত্যুর জন্য আমিই দায়ি।

সমস্ত পাহাড়িরা তখন শোকস্তব্ধ হয়ে জড় হয়েছে সেখানে। অনেকেরই চোখে জল।

লালচাঁদের লোকেরা সেই অগ্নিকুন্ডের ছাই ভস্ম ঘেঁটে রঞ্জনের আধপোড়া শরীরটাকেও যদি পাওয়া যায় সেই চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু না। সেখানে শুধু মুঠো মুঠো ছাই ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট ছিল না।

শবনম ভয়ংকরী মূর্তিতে সাপিনীর মতো ফুঁসে উঠে বলল --নিয়ে এসো ঐ শয়তান দুটোকে।

পাহাড়িরা ধৃত ডাকাত দুটিকে নিয়ে এলো।

--এইখানে এই গাছটার সঙ্গে বাঁধো।

একটা আধমরা পলাশ গাছের গুঁড়িতে আস্টে পিস্টে বাঁধা হ'ল দুজনকে।

শয়তান দুটো তখনো নির্লজ্জের মতো প্রাণ ভয়ে ভীত হয়ে চেঁচাতে লাগল—একবার। শুধু একবার আমাদের ক্ষমা করো দেবী। আমরা কসম খাচ্ছি আজ থেকেই এই দস্যুবৃত্তি ছেড়ে দেবো আমরা। আমরা ভালো হবো।

শবনম বলল—ভালো তোমরা এমনিতেই হবে। কারণ আর কিছুক্ষণের মধ্যেই অগ্নিশুদ্ধি হয়ে আল্লাহর দরবারে পেঁছে যাবে তোমরা। আবার নতুন করে মাতৃগর্ভে জন্ম নিয়ে নতুন দেহ ধারণ

করে পৃথিবীতে এসে সৎভাবে জীবন যাপন করবে। তখন ভালো হবার চেষ্টা কোর। এ জনমে প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে আর ভালো হতে যেও না।

—কিন্তু দেবী, আমরা যে এ জন্মেই বেঁচে থেকে সৎভাবে জীবন যাপন করতে চাই। ভালো হতে চাই।

—তা তো আর সম্ভব নয়। সময় পার হয়ে গেছে।

—কোন উপায়েই কি এই অসম্ভবকে সম্ভব করানো যায় না? একটু কৃপা করুন দেবী।

শবনম বলল—আমি এখনি তোমাদের মুক্তি দিতে পারি। কিন্তু একটি মাত্র শর্তে।

—বলুন কি সে শর্ত?

—আমার রঞ্জনকে ফিরিয়ে দিতে হবে! তোমাদের নৃশংস অত্যাচার ও অগ্নিকান্ডর ফলে এই পাহাড়িদের যে সব নীরিহ নারী পুরুষ যুবা বৃদ্ধ শিশু পুড়ে মরেছে, তাদের প্রাণ ফিরিয়ে দিতে হবে। পারবে? যদি পারো মুক্তি দেবো।

—তা কি করে সম্ভব?

—তাহলে তোমরা মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও। বলেই ভয়ংকরী নাদে চিৎকার করে উঠল শবনম—আগুন—আগুন আগুন জ্বালাও। পুড়িয়ে ছারখার করে দাও এই পাপিষ্ঠদের।

প্রচুর শুকনো ডালপাতা এবং খড় এনে ঐ ধৃত বন্দীদের গায়ের ওপর রাখা হ'ল। তারপর একটা জ্বলন্ত মশাল এনে ধরিয়ে দিতেই দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল আগুন। আর সেই অগ্নিশিখার লেলিহান জিহ্বার গ্রাসের ভেতর থেকে অত্যাচারীদের অন্তিম হাহাকার শোনা যেতে লাগল। ওরা অগ্নিদগ্ধ হয়ে যত চিৎকার করতে লাগল শবনম ততই হাসতে লাগল হো হো করে। সে কি ভয়ংকর পৈশাচিক হাসি। এ যেন স্বাভাবিক কোন মানুষের নয়। সম্পূর্ণ অপ্রকৃতিস্থ এক কিশোরীর অথবা ফুলন দেবী বা দুর্ধর্ষ নতুন পুতলিবাঈ-এর।

হাসতে হাসতেই এক সময় সজ্ঞাহীন হয়ে লুটিয়ে পড়ল শবনম।

হিংলাজ সর্দার তাকে ধরে পাঁজা কোলা করে বেশ বড় সড় একটা পাথরের ওপর শুইয়ে দিল। পাহাড়ি মেয়েরা এসে ওর চোখে মুখে জলের ঝাপটা দিতে লাগল। কিন্তু শবনমের জ্ঞান ফিরল না। সে নিথর নিষ্পন্দ হয়ে গভীর ঘুমে ঘুমিয়ে রইল যেন।

অবশেষে কাল-রাত্রির অবসান হ'ল। গভীর অরণ্যানীর মধ্যে ভোরের বারতা নিয়ে কলতান করে উঠল বনের পাখিরা। মানুষের সুখ দুঃখের কথা ওরা কি বুঝতে পারে? বোধ হয় পারে না। তাই ওদের এই চঞ্চলতায় কোথাও কোন মলিনতা নেই। জগতের আনন্দ যজ্ঞে ওরা তাই সদানন্দময়। এ ডাল থেকে ও ডালে গান গেয়ে গেয়ে নেচে বেড়াচ্ছে সব। কেউ বা মহাশূন্যে ঘুরপাক খাচ্ছে। শবনমকে ঘিরে অনেকগুলি রাত জাগা মানুষ তখন উৎকণ্ঠিত হয়ে বসে আছে।

পাহাড়িয়া বস্তীতে তখন কান্নার রোল। সকলের সবকটি ঝোপড়ি ভস্মীভূত হয়েছে। শিশু ও বৃদ্ধ সহ মোট পাঁচজন মারা গেছে আগুনে পুড়ে। সেই মর্মান্তিক দৃশ্য দেখা যায় না।

পাহাড়িদের মধ্যে যারা একটু বলবান তারা আবার শুরু করল তাদের কাজ। অর্থাৎ গাছের ডালপাতা কেটে নতুন নতুন ঝোপড়ি তৈরী করতে লেগে গেল! আবার নতুন করে বাঁচতে হবে তো।

হিংলাজ সর্দারের পোষা কুকুরটাকে দেখা যাচ্ছে না। সেটাও আগুনে পুড়ে মরল নাকি? কত হাঁস মুরগী গরু ছাগল যে পুড়ে মরেছে তার শেষ নেই। কুকুরটা কোথায় গেল কে জানে?

ওরা যখন আবার নতুন করে বাঁচার কথা ভাবছে তখন সেই শান্ত প্রকৃতির বুকে পাহাড় ও বনভূমি ভেদ করেই যেন আবির্ভূত হলেন এক তেজোময় সন্ন্যাসী। কী দারুণ সৌম্য মূর্তি তাঁর। মাথায় জটা। গলায় রুদ্রাক্ষ পরণে লাল চেলি। এক হাতে চিমটা অপর

হাতে কমণ্ডলু। সন্ন্যাসী খালি পায়ে মন্ত্রোচ্চারণ করতে করতে এগিয়ে এলেন - অসতো মা সদ্‌গময়ো তমসো মা জ্যোতির্গময়ো···। তারপর এই ধ্বংসস্তূপের সামনে এসে থমকে দাঁড়ালেন। বললেন— আহারে! এমন সাজানো সংসার ছারখার করে দিল কে?

হিংলাজ সর্দার লুটিয়ে পড়ল সন্ন্যাসীর পায়ে। বলল কে আপনি প্রভু? সাধু মহাত্মা! এই গরীবের দেশে পায়ের ধুলো দিলেন? এর আগে আর তো কখনো আপনাকে দেখিনি এখানে?

সন্ন্যাসী হাসলেন। বললেন—আমাকে তোরা দেখবি কি করে? আমি তো এখানকার লোক নই। ওঙ্কার তীর্থ থেকে আসছি। পায়ে হেঁটে পাহাড় পর্বত ডিঙিয়ে শুধু পথই চলেছি - পথই চলেছি।

হিংলাজ বলল—এই পথ চলার শেষ হবে কোথায়?

—তা তো জানি না। শুধু পথের রেখা ধরে যে দিকে দু'চোখ যায় সেদিকে চলে যাবো। দু'দিন বিশ্রাম করব। ভালো লাগলে সেখানে কিছুদিন থাকব। না লাগলে একদিনও না থেকে চলে যাবো।

—বাঃ। বেশ মজার ব্যাপার তো। কী সুখের জীবন আপনার। কিন্তু বাবা! আপনি কি কোন কারণেই স্থায়ী ভাবে ডেরা পাতবেন না কোথাও?

কেন পাতব না? তবে স্থায়ী ভাবে ডেরা পাতবার মতো কোন সুযোগ সুবিধা যদি কখনো আসে বা সেরকম পরিবেশ পাই তাহলে নিশ্চয়ই থেকে যাবো। কিন্তু তোমাদের এই সুখের স্বর্গ শ্মশান হ'ল কি করে?

অন্যান্য পাহাড়িরাও তখন ঘিরে ধরেছে সন্ন্যাসীকে। এই সন্ন্যাসীকে দেখলে বেশ বুদ্ধিমান, জ্ঞানবান, বিবেচক এবং সাধক বলেই মনে হয়। সকলে একে একে সন্ন্যাসীকে প্রণাম করে বলল— আমরা এক সন্ত্রাসের রাজত্বে বাস করছি সাধুবাবা।

—কি রকম !

—হিন্দোল সর্দার নামে এক কুখ্যাত দস্যু আমাদের ওপর যখন তখন অত্যাচার করে। তার নৃশংস অত্যাচারের বলি কয়েকটি তাজা প্রাণ আর আমাদের এই পাতার ঘরগুলোর ভস্মাবশেষ।

তোমরা প্রতিরোধ করতে পারোনি ?

—আমরা নিরস্ত্র। তার ওপর ওরা অতর্কিতে আমাদের ওপর আক্রমণ চালিয়ে এই কান্ড করেছে।

সন্ন্যাসীর দু'চোখে ক্রোধের আগুন। বললেন—তাই নাকি ?

—হ্যাঁ বাবা। দৈবক্রমে একটি কিশোরী হঠাৎ কোথা থেকে এখানে এসে পড়ে বন্দুক চালিয়ে ওদের বদলা নেয় বা আমাদের জীবন রক্ষা করে। ওর এক সঙ্গী কিশোরও এই অগ্নিকাণ্ডে মারা যায়। তাই কাল রাত থেকে মেয়েটি অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে।

—বলো কি ! কে সেই মেয়ে ? কোথায় সে ?

—সে যে কে তা ঈশ্বরই জানেন। মানবী কি দেবী না কোন মন্ত্রসিদ্ধ যক্ষিণী তা আমরা বুঝে উঠতে পারছি না। চোদ্দ পনেরো বছরের মেয়ে। জাতিতে মুসলমান। সঙ্গে এক কিশোর। সে হ'ল হিন্দু। একটা ট্রেন দুর্ঘটনার পর ভীষণ প্রতীজ্ঞা নিয়ে দুর্ঘটনা যারা ঘটিয়েছে তাদের বদলা নেবার উদ্দেশ্যে এখানে এসে হাজির হয়। মজার কথা ঐ কিশোরী মেয়েটি যেন হঠাৎই এক দৈবশক্তির প্রভাবে ভয়ংকরী হয়ে ওঠে। সে একাই ঐ দুর্ধর্ষ ডাকাতদের প্রায় নির্মূল করে এনেছে। কৌশলে ডাকাত মেরে তাদের বন্দুক ছিনতাই করে ডাকাতদের মধ্যে মড়ক সৃষ্টি করে দিয়েছে। সে যেন এক কিশোরী ফুলনদেবী। আমরা তাকে দেবী বলি।

সন্ন্যাসী লাফিয়ে উঠলেন—জয় মা ! জয় মা ! এসেছে। এসেছে। এতদিনে আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে।

—কে এসেছে বাবা ?

—সে তোমরা বুঝবে না। কিন্তু আমি জানি সে কে। আমার

ডাকে সাড়া দিয়ে সে এসেছে। তাকে আসতেই হবে। নাহলে আমার এতদিনের সাধনা বিফল হয়ে যাবে যে।

—আমরা আপনার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না।

—আমি তোমাদের বুঝিয়ে দেবো। ঐ যে মেয়েটি ভয়ঙ্করী মূর্তিতে তোমাদের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছে, ও তো মানবী নয়। দেবী। মা ভবানী। এই পাহাড়ের এক গোপন স্থানে মা ভবানী দীর্ঘ কুড়ি বছর উপবাসী আছেন। তাই মা তাঁর রক্ত পিপাসা মেটাতে আবির্ভূতা হয়েছেন ঐ কিশোরীর রূপে।

—কিন্তু বাবা, আমরা হিন্দু। মা ভবানী আমাদের দেবী। ও যে মুসলমানের মেয়ে।

—ওরে নির্বোধ। আমরা সবাই মায়ের সন্তান। আমাদের কি জাত আছে? না আমাদের কোন নির্দিষ্ট ধর্ম আছে? আমাদের জাত একটাই। আমরা মানুষ। গরু নয়, বাঁদরও নয়। তবে আমাদের অনেকের প্রকৃতির মধ্যে অবশ্য অনেক হিংস্র জানোয়ারের মিল আছে।

—কিন্তু ওরা তো গরু খায়।

—ওরা তো জলও খায়! তোরা জল খাস না? সূর্যের কিরণ ওরা গায়ে মাখে। তোরা মাখিস না? যে বাতাসে ওরা শ্বাসপ্রশ্বাস নেয় সেই বাতাস তোরাও তো নিস? তার বেলা? মা যে কবে তোদের সুমতি দেবে! তা চল দেখি কোথায় তোদের সেই দেবী। আমাকে এখুনি নিয়ে চল তার কাছে।

সবাই তখন সব কাজ ফেলে সেই মহাপুরুষকে নিয়ে চলল শবনমের কাছে। সন্ন্যাসী ঠাকুর যেন এই মানুষগুলোর আশার প্রদীপ।

লালচাঁদ ও তার দলের লোকেরা এবং কয়েকজন পাহাড়ি মেয়ে পুরুষ গাছতলায় বড় একটি পাথরের বুকে শায়িতা শবনমকে ঘিরে ছিল।

সন্ন্যাসীকে দেখেই সসম্ভ্রমে সরে বসল সকলে। সন্ন্যাসী তাঁর

দীর্ঘ শরীর নিয়ে বলিষ্ঠ পদক্ষেপে ছোট একটি পাথরে পা দিয়ে উঠে পড়লেন পাথরের চটানে !

শবনমের তখন জ্ঞান ফিরেছে। কিন্তু সে বড় ক্লান্ত। বন্দুকটা ওর পাশেই শোয়ানো আছে। ও ধীরে ধীরে চোখ মেলে ফ্যাল ফ্যাল করে আকাশের দিকে তাকিয়েছিল।

সন্ন্যাসী কাছে গিয়ে কমণ্ডলু থেকে খানিকটা জল নিয়ে ওর চোখে মুখে ঝাপটা দিয়ে বললেন—এখন কেমন আছিস মা ?

শবনমের ঠোঁট দুটি বারেকের তরে একবার কেঁপে উঠল। কি যেন বলতে গেল সে কিন্তু পারল না।

সন্ন্যাসী বললেন—তোর কথা আমি সব শুনেছি। একটু সুস্থ হ তুই। আমি নিজে হাতে ফুল এনে তোর পুজো করব। মালা গেঁথে তোকে পরাবো। নিজে হাতে তোকে পেট ভরে খাওয়াবো। তুই যে দীর্ঘদিন উপবাসী আছিস। আজ কুড়ি বছর কেউ তোকে ফুল বেলপাতা দিয়ে পুজো করেনি। আজ তোর নতুন করে অভিষেক হবে মা।

বিস্মিত শবনম ধীরে ধীরে উঠে বসল। বলল—হে যোগীরাজ ! কে আপনি ? কাকে কি বলছেন ? আপনি কি জানেন আমি যবন কন্যা ?

—তুই কি জানিস অসুর নিধনের জন্যে মা ভবানীকেও একদিন কালী হতে হয়েছিল ? আমি সন্ন্যাসী। আমার যেমন জাত নেই, তুই তেমনি দেবী। তোরও কোন জাত নেই। কি নাম তোর ?

—আমার নাম শবনম।

সন্ন্যাসী গগন কাঁপিয়ে হো হো করে হেসে উঠলেন।

—আপনি হাসছেন কেন বাবা ?

—ওরে পাগলি। তোর নামই যে বলে দিচ্ছে তোর কোন জাত নেই।

—আমার নামই বলে দিচ্ছে আমার কোন জাত নেই ?

—হ্যাঁ। তোর নামের মধ্যেই যে তোর পরিচয় লুকিয়ে আছে। তোর প্রকাশ যে তোর নামেই।

—আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

কমণ্ডলু থেকে খানিকটা জল নিয়ে পৃষ্ঠা—১০১

—পারবি না তো। আসলে নিজেকে বোঝবার চেষ্টা কেউ করে না। শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন 'সর্ব ধর্মাণ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং

ব্রজ।' অর্থাৎ হে ব্রজবাসীগণ! তোমরা ধর্ম ধর্ম করে অযথা হানাহানি না করে সর্ব ধর্ম পরিত্যাগ করে আমাকে অর্থাৎ 'আমি কৃষ্ণকে' শরণ করো। বা নিজেকে চিন্তা করো।

—তাহলে কি বলতে চান ধর্ম বলে কিছু নেই?

—আছে বৈকি। মানুষের কর্মই ধর্ম। তোর নাম শবনম। 'শব' কাকে বলে জানিস?

—মরা মানুষকে।

মড়ার জাত আছে?

—নেই।

—'নম' মানে?

—নমো।

—তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে? তুই শব অর্থাৎ তোর কোন জাত নেই। আর নেই বলেই তোকে নমো করছি। পুজো করব বলে।

শবনম সন্ন্যাসীর পায়ের ওপর আছাড় খেয়ে পড়ল। বলল—বাবা! আজ থেকে আমি আপনার মেয়ে। আমাকে আপনার চরণে আশ্রয় দিন বাবা।

—ওরে পাগলি! তোর যে এখন অনেক কাজ বাকি। অসুর নিধন করবি না? ওহে ও লালচাঁদ! এ বেটিকে একটু বুঝিয়ে দাও। এত সহজে আশ্রয় নিলে নদী যে মজে যাবে। আরে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে দেখছ কি? মেয়েটাকে কিছু খেতে টেতে দাও। আর তুমি বাবু তোমার ঐ পুলিশি পোষাক ছাড়ো। ঐ পোষাকে তোমাকে মানায় না। যদি পারো তো একটু দুধ গরম করে খাওয়াও মেয়েটাকে।

হিংলাজ সর্দার বলল—দুধ তো এখানে পাওয়া যাবে না। আমাদের গবাদি পশুগুলো অর্ধেক মরেছে অর্ধেক ছাড়া পেয়ে পালিয়েছে।

—সে যাই হোক। এখনই ওর কিছু খাদ্যের প্রয়োজন। ও

বড় দুর্বল। আমার এক শিষ্যকে আমি অন্য কাজে লাগিয়েছি। সে একাই চেষ্টা করছে মা ভবানীর মূর্তিটাকে জঙ্গলের ভেতর থেকে উদ্ধার করতে। জঙ্গল সেখানে এত গভীর যে একা পেরে উঠবে না সে। মূর্তিটা আশা করি ওখানেই থাকবে। কেননা পাহাড়ের গুহার ভেতরে বড় পাথর কুঁদে তৈরী মূর্তি। কেউ নিয়ে যেতে পারবে না। আমি যাবার আগে ঐ ছোট্ট গুহামুখ পাথর দিয়ে এঁটে গিয়েছিলাম। সেখানটা তো চেনাই যায় না। লোকটা একা আছে। আমি এসেছিলাম আরো কিছু লোকজন সংগ্রহের আশায়। এমন সময় এখানে এসে দেখি এই কান্ড। সত্যি! এই দীর্ঘ কুড়ি বছরে কত পরিবর্তন না হয়েছে। তুমিও অনেক পাল্টে গেছ লালচাঁদ। মোটা হয়েছ। কিন্তু এই বেশে এখানে যে তোমাকে আমি দেখব তা স্বপ্নেও ভাবিনি। আসলে ব্যাপার কি জান, পাপের ভারা পূর্ণ না হলে পাপীর পতন হয় না। রাবণ বংশ একদিনে ধ্বংস হয়নি। তেমনি, সময় না হলে হাজার চেষ্টা করলেও যার সঙ্গে দেখা হবার নয় তার দেখা পাওয়া যাবে না। তবু ভালো দেবী আমার ডাক শুনেছেন। আজ গুহা মন্দির সংস্কার করে এসো আমরা সবাই মিলে মা ভবানীর অভিষেক করি। তাড়াতাড়ি চলো সবাই।

লালচাঁদ অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলেন সন্ন্যাসীর দিকে। সে দৃষ্টিতে যে কি প্রচন্ড বিস্ময় তা বলে বোঝানো যাবে না। লালচাঁদ বললেন আ-আ-আপনি—!

—মনে করে দেখো। দীর্ঘ কুড়িটা বছর পিছিয়ে যাও লালচাঁদ। খোংগসারার জঙ্গলে ঐ বিশ্বাসঘাতকের বিশ্বাসঘাতকতার বলি হয়েছিলাম আমরা। বিনা অপরাধে আমার মৃত্যুদন্ডের আদেশ হয়েছিল। তোমারই সহযোগিতায় জেল হাজত থেকে পালাতে পেরেছিলাম আমি। তুমি তোমার একমাত্র পুত্রকে হারিয়েছিলে।

—আমার স্ত্রীকেও ঐ শয়তানের চরেরা তুলে নিয়ে গিয়েছিল।

—তারপর থেকে কত খুঁজেছি তোমাকে। কিন্ত বৃথা চেষ্টা করেছি। এমন সময় এক সদ্‌গুরুর সন্ধান পাই। তাঁর কাছে দীক্ষা নিয়ে সন্ন্যাস জীবন যাপন করছি। বেশ আছি। ছিলাম নর্মদার তীরে ওঙ্কার তীর্থে। হঠাৎ একদিন স্বপ্ন দেখলাম মা ভবানীকে। দেখলাম মার চোখে জল। মা যেন আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছেন। সারা গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। আমার এক চ্যালাকে সঙ্গে নিয়ে ঘুরতে ঘুরতে চলে এলাম এখানে। এসে দেখি এই সব কাণ্ড।

লালচাঁদ লাফিয়ে উঠলেন—জয় মা ভবানী। জয় জগদম্বে। কিন্তু আপনি যে এখনো বেঁচে আছেন তা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি সর্দার। আপনি ওঙ্কার তীর্থে, আমি খাণ্ডোয়ায়। কত কাছাকাছি। অথচ কেউ কাউকে দেখিনি এতদিন!

—ওঙ্কারতীর্থে আমি কিছুদিন আগে এসেছিলাম। তার আগে দীর্ঘ দিন ছিলাম কর্ণাটকে তুঙ্গভদ্রার তীরে।

—ঠিক আছে। ঐ শয়তানের কেল্লা দখল করে আপনার কেল্লা আপনারই হাতে তুলে দেবো সর্দার। হিন্দোল কেল্লা হিন্দোল সর্দারেরই থাকবে। জয় হিন্দোল সর্দারের জয়। জয় মা ভবানীর জয়।

শবনম বলল—আপনিই হিন্দোল সর্দার!

—হ্যাঁ মা, যে মানুষ ডাকাত ছিল কিন্তু কখনো কোন নিরীহ প্রাণীকে অকারণে হত্যা করেনি, আমিই সেই।

—তাহলে ঐ লোকটা কে?

—ওর নাম দুর্জন সিং। আমার দলে ছিল। ভেতরে ভেতরে ওর দলের কিছু লোককে আমার দলে ঢুকিয়ে আমার লোকেদের সরিয়ে দিয়ে আমাদের দুজনের ওপর চরম বিশ্বাসঘাতকতা করে ঐ কেল্লায় সর্দার হয়ে বসে। সবাই জানে ওটা হিন্দোল সর্দারের কেল্লা। কিন্তু শয়তান দুর্জন সিং-এর কথা কেউ জানে না। আর

জানে না ওর বিশ্বাসঘাতকতার কথা। নতুন যুগের মানুষরা ঐ অত্যাচারীটাকেই হিন্দোল সর্দার বলে জানে। আমার নামকে কলঙ্কিত করেছে ঐ শয়তানটা। পাছে কেউ চিনে ফেলে তাই মুখে কাপড় বেঁধে ডাকাতি করতে যায়। নানারকম নোংরামি করে দিনের পর দিন আমার নামে চালিয়ে যায়। সমস্ত কুকর্মের দায় আমার ঘাড়ে পড়ে। এখন ও নিজেকেই হিন্দোল সর্দার বলে প্রচার করছে।

শবনম বলল—তাতে ওর লাভ ?

—আমি পলাতক। আইনের চোখে আমি মারাত্মক অপরাধী। এই সময় সব রকমের কুকর্ম আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া তো খুব সোজা। ওর পাপ আমার খাতায় দিনের পর দিন জমা হয়। আর আমি ধরা পড়বার ভয়ে সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশে স্রোতের ধারার মতো গড়িয়ে বেড়াই। না পারি দল গঠন করতে, না পারি ওকে আক্রমণ করতে। শুধু জানতে পারি আমার কেল্লা দখল করে ও দারুণ মজা লুটছে। বড় বড় ব্যবসায়ীর সঙ্গে পুলিশের সঙ্গে ওর আঁতাত। ফলে অনেকাংশেই ও নিরাপদ।

শবনম বলল—এর কি কোন প্রতিকার নেই ?

—থাকবে না কেন ? তবে এখন আমি সাধন মার্গে আসার পর আমার মনের অবস্থা এমনই যে ঐ তুচ্ছ ভোগ দখলের ব্যাপারটা বা প্রতিশোধ নেবার ব্যাপারটা মন থেকে দূর হয়েছে! তবে একেবারে যে আসক্তিহীন তাও নয়। বিশেষ বরে মা ভবানীর সেবা পূজা করবার জন্যে মনটা আমার বড়ই উন্মুখ হয়ে আছে। আজ থেকে কুড়ি বছর আগে এখানে কোন মানুষের বসতি ছিল না। সেই দুর্ভেদ্য অরণ্যে দিনের আলো প্রবেশ করত না। শিবাজীর পুণা দুর্গের মতো আমার কেল্লাও ছিল অপ্রতিরোধ্য। অবশ্য এখনো তাই। আসলে এখানকার প্রাকৃতিক অবস্থান সব কিছুকেই দুর্ভেদ্য করে রেখেছে।

শবনম বলল—আপনি কি পারেন না আবার স্বরূপে এখানে প্রতিষ্ঠিত হতে ?

—কেন পারব না ? সকলের সহযোগিতা পেলে নিশ্চয়ই পারব। তবে মা, আগের মতো ভোগ বাসনা এখন আর নেই আমার। কিন্তু প্রতিশোধ একটা নেওয়া দরকার। তাছাড়া ঐ দুরাত্মার অত্যাচার এখুনি বন্ধ হওয়া প্রয়োজন। যে নারীকে আমি চিরকাল মায়ের মর্য্যাদা দিয়ে এসেছি ঐ পাপাত্মা তাকেও কলঙ্কিত করেছে। আমি আজকে সাধু হলেও এক সময় ডাকাত ছিলাম। এখন রত্নাকর থেকে বাল্মীকি হলেও তখন আমার মধ্যে প্রচন্ড বদ বুদ্ধি ছিল। অনেক বড় বড় ডাকাতি করেছি। আমার চিঠি নিয়ে লোক যেত। আমার চাহিদার কথা জানিয়ে দিত। পাওনা পেলে চলে আসতাম। বাধা পেলে লড়াই জমত।

—কিন্তু কেন আপনি এসব করতেন বাবা ?

—ওরে পাগলি ! কৈশোর বয়সে মা বাবাকে হারিয়ে যে ছেলে পথে পথে ঘোরে আর সামান্য একটু পেট ভরাবার তাগিদে মানুষের কাছ থেকে যে দুর্ব্যবহার পায় সে যদি কখনো বদলা নেবার সুযোগ পায় তাহলে কেন সে বিপথগামী হবে না ? তোর ফুলনদেবী আর পুতলী বাঈ কি এমনি ডাকাতনি হয়েছিল ?

—আপনি কি করে ডাকাতদের দলে ভিড়েছিলেন ?

—সে অনেক কথা। বলতে পারিস মা ভবানীর কৃপায়। এই যে তুই একটা ভালো ঘরের মেয়ে। তুই কেন খুনের নেশায় মেতে উঠেছিস ? এমনিই অবস্থার ফেরে মানুষ আর মানুষ থাকে না। তবে দুর্জনসিংটা বিশ্বাসঘাতক। নাহলে এই লালচাঁদও তো আমার হাতে গড়া। কই ও তো কখনো বেইমানি করেনি। বরং আমার ফাঁসীর আদেশ হবার পর ও দলবল নিয়ে এমন ভাবে আমাকে পালাবার সুযোগ করে দেয় যে ওর ঋণ আমি কখনও শোধ করতে পারব না। ঐ কাজ করতে গিয়ে ও এবং দু'একজন ছাড়া

সবাই পুলিশের গুলিতে নিহত হয়। এদিকে দুর্জন সিং তার লোকেদের নিয়ে কেল্লা এমনভাবে দখল করে যে তার ধারে কাছে কারো যাবার উপায় থাকে না। তা যাক। ওসব আলোচনা এখন না করাই ভালো। এখন আর বৃথা সময় নষ্ট না করে চলো সবাই মা ভবানীর গুহামন্দির সংস্কারের কাজে যাই।

সবাই তখন 'জয় হিন্দোল সর্দারের জয়' বলে কোদাল, কুড়ুল, গাঁইতি নিয়ে সন্ন্যাসীর সঙ্গে এগিয়ে চলল।

লালচাঁদ তাঁর কয়েকজন লোককে হিন্দোল কেল্লার দিকে নজর রাখতে বলে দুজনের কানে কানে ফিস ফিস করে কি যেন বলতেই তারা চলে গেল সম্পূর্ণ অন্যদিকে।

পাঁচ

পাহাড়িদের মনে এখন দারুণ আনন্দের জোয়ার। তাদের একঘেয়ে কর্মময় ক্রীতদাসের মতো যাপন করা জীবনে যেন নবসূর্যোদয়। ওরা হৈ হৈ করে এক জায়গায় গিয়ে দেখল সাধুবাবার একজন লোক জঙ্গলের গভীরে পাহাড়ের ত্রিকোণাকৃতি একটি অংশে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে।

সাধু বললেন—ঐ সেই স্থান। যেখানে আছে ছোট্ট একটি গুহামুখ। সংকীর্ণ একটু অংশের মধ্য দিয়ে মাত্র দু'ফুট ফাঁক। সেটিকে অতিক্রম করতে পারলে মা ভবানীর গুহায় প্রবেশ করা যাবে।

হিংলাজ সর্দার বলল—কিন্তু বাবা, গুহার মুখ কোনখানে? আমরা তো বুঝতেই পারছি না।

—কি করে পারবি? সে মুখ আমি বুজিয়ে দিয়ে গেছি। তোদের কাছে গেলাম তবে কি জন্যে? ঐ মুখ আজ এখুনি খুলব। নে, এখন তোরা এই জায়গাটার জঙ্গল সাফ কর।

সবাই একবার তাকিয়ে দেখল শবনমের দিকে।

শবনম বলল—দেখবার কিছু নেই। কাটো। প্রয়োজনে অনেক কিছুই করবে! কিন্তু অপ্রয়োজনে কিছুই করবে না। তবে এক কাজ করো। সামনের দিকটা জঙ্গল রেখে একেবারে গুহামুখের দিক থেকে চার হাত মাপ করে কাটো।

এগুলো অবশ্য ভালো গাছের জঙ্গল নয়। বড় বড় চীহড়লতায় ঘনান্ধকার করে ঢাকা। আগাছা, কাঁটাবন ও বনতুলসীর ঝাড়।

সাধুবাবা বললেন—জঙ্গলের গাছপালার ওপর তোর খুব মমতা দিখছি।

—হ্যাঁ বাবা। একটা গাছের ডাল কাটলে আমার মনে হয় কেউ যেন আমার একটা হাতই কেটে নিচ্ছে।

কোদাল কুড়ুল গাঁইতির ব্যবহারে মিনিট কয়েকের মধ্যেই বুনো ঝোপগুলো সাফ হয়ে গেল। ওগুলোকে এমনভাবে কাটা হ'ল যাতে করে হঠাৎ কেউ এসে পড়লে বাইরের জঙ্গল দেখেই বুঝতে পারবে না এর ভেতরে এমন পরিষ্কার জায়গা আছে। জঙ্গল পরিষ্কারের সময় দু'একটা খরগোশ গর্তর ভেতর থেকে লাফিয়ে পালাল। একটা বিষাক্ত সাপ ফাটল থেকে বেরিয়ে ফোঁস করে উঠতেই হিংলাজ সর্দারের গাঁইতির ঘায়ে শেষ হয়ে গেল সেটা।

সাধুবাবা বললেন—ভুল করলি বেটা। এমনি ভাবে কোন নিরীহ প্রাণীকে মারে না কেউ। ওকে কিছু না বললে ও এমনিই পালিয়ে যেত। যাক, এখন ঐ পাথরের খাঁজে খাঁজে চাড় দে।

সবাই মিলে গাঁইতির চাড় দিতেই এক এক করে সাজানো পাথর খসে খসে পড়তে লাগল। শাবলের ঘা আর গাঁইতির চাড়। কিছু সময়ের মধ্যেই অপরিসর একটি মানুষ প্রমাণ পাহাড়ের খাঁজ ফাঁকা হয়ে গেল।

সাধু বললেন—জয় মা ভবানী। এবার চলো সব এক এক করে ঢুকে দেখি আমার মা কি অবস্থায় আছে। তবে এখুনি সবাই নয়। আগে আমি আর এই জ্যান্ত ভবানী ভেতরে ঢুকব।

শবনম সাধুবাবার হাত টেনে ধরে বলল—একটু অপেক্ষা করুন বাবা। এখুনি ঢুকবেন না।

—ভয় কিরে পাগলি ?

—ভয় আছে বৈকি। কুড়ি বছরের বন্ধ গুহা আলো বাতাসের সংস্পর্শে না থাকায় এর ভেতরে একটা বিষাক্ত গ্যাসের সৃষ্টি হয়ে আছে। এখন যে ঢুকবে সেই মরবে।

সাধুবাবা বললেন—তুই ঠিক বলেছিস তো। এই সহজ কথাটা আমার মাথায় আসেনি। অক্সিজেনের অভাবে এর ভেতরটা যে

কি হয়ে আছে তা কে জানে ? এই বদ্ধ গুহায় ঢুকলেই এখন মৃত্যু।

তার প্রমাণ অবশ্য হাতে হাতেই পাওয়া গেল।

গুহা মুখ অর্গলমুক্ত হওয়ার ফলে গুহার ভেতর থেকে একটা গরম ভাপানি যেন ভক ভক করে বেরিয়ে আসতে লাগল। ভেতরটা যত অক্সিজেনে ভরতে লাগল বাইরের শীতল বাতাস ততই ঢুকতে লাগল হু হু করে।

সাধুবাবা হিংলাজকে বললেন—কাছেই একটা ছোট্ট ঝর্ণা ছিল। সেটা শুকিয়ে গেছে কি ?

—না বাবা, ঝর্ণার মিঠা পানি খেয়েই তো আমরা বেঁচে আছি।

—তাহলে যাও। তোমাদের বস্তী থেকে কয়েকটা বালতি নিয়ে একটু ঝর্ণার জল এনে জায়গাটা ধুয়ে মুছে দাও। আর কাউকে পাঠিয়ে দাও কোথাও থেকে পাহাড়ি গাছ গাছড়ার ফুল নিয়ে আসতে। কিছু বেলপাতাও নিয়ে এসো। এখানে অনেক বেলগাছ আমি বসিয়েছিলাম। সে সব গাছ এখনো আছে দেখছি। যাও দেরি করো না। মায়ের থান পরিষ্কার করতে হবে। মাকে ঝর্ণার জল দিয়ে স্নান করাতে হবে।

শবনম বলল—একটু আলোর ব্যবস্থাও তো করতে হবে। অনেকগুলো মশাল পড়ে আছে আসপাশে।

হিংলাজ বলল—সব ব্যবস্থা আমি করে দিচ্ছি।

প্রায় ঘন্টাখানেকের মধ্যেই সব কিছুর ব্যবস্থা হয়ে গেল। পাহাড়ি ললনারা প্রচুর ফুল বেলপাতা সংগ্রহ করল। বেশীর ভাগই আকন্দ কলকে, করবি, জুঁই ও গুলঞ্চ। সাধুরই সযত্নে বসিয়ে যাওয়া গাছেরা বংশানুক্রমে ফুল দিয়ে যাচ্ছে। তবে এই ফুল এতদিন শুকিয়ে মাটিতে ঝরছিল। এখন মালা হয়ে দেবীর গলায় দুলবে।

মশাল হাতে নিয়ে সাধু শবনমের একটি হাত ধরে ভেতরে ঢুকলেন। লালচাঁদও ঢুকল ভেতরে। বাকিরা রইল প্রতীক্ষায়।

সাধু ভেতরে ঢুকেই দেখলেন মা ভবানী যেখানকার সেখানেই

প্রতিষ্ঠিতা আছেন। শুধু চারিদিক মাকড়সার জালে ভরে আছে।

সেটুকু পরিষ্কার করতে আর কতক্ষণ ?

পাহাড়িরা বালতি বালতি জল এনে দিতে লাগল। সাধু শবনমকে বললেন ঢাল বেটি দেবীর মাথায়।

কিন্তু বাবা !

—আরে ! আমি তো বলছি। আজই তোকে আমি দীক্ষা দেবো। একেবারে সনাতন ধর্মে দীক্ষা। যে ধর্মে কোন হিন্দু মুসলমানে ভেদাভেদ নেই। তুই মাকে স্নান করাবি গা মুছিয়ে দিবি। তোর হাতে গাঁথা মালা যখন মা ভবানীর গলায় দুলবে তখন ত্রিলোক পর্যন্ত দুলে উঠবে। হিন্দু মুসলমানের কোন ভেদাভেদ থাকবে না। জয় মা ভবানী। নে ঢাল দেবীর মাথায় জলের ধারা।

আনন্দের আবেগে শবনমের দু'চোখে যেন জল এসে গেল। আজ এই চরম সুখের মুহূর্তটিতে ওর বড় বেশী করে মনে পড়ল রঞ্জনের কথা। ঐ সুস্থ সুন্দর সুদর্শন কিশোরের মর্মান্তিক মৃত্যুর কথা ও এখনো ভুলতে পারছে না। আজ যদি রঞ্জন ওর পাশে থাকত। ওর বুক ভরে উঠত এক অনাস্বাদিত সুখে। ওর বাবা মা জানেনও না তাদের অতি আদরের ছেলেটির এই নিঠুর নিয়তির কথা। 'তার' পেয়ে তাঁরা এখনো কত নিশ্চিন্তে আছেন। কিন্তু যখন দিনের পর দিন যাবে অথচ ঘরের ছেলে ঘরে ফিরবে না তখন কি যে করবেন তাঁরা ? তা কেই বা জানে ? রঞ্জনের ঠিকানাও জানে না শবনম। যে খবর দেবে। কিন্তু কি খবরই বা দেবে ? ম্যাণ্ডিভিলা গার্ডেনের পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে কি ঐ নামের কোন নির্দ্দিষ্ট ছেলের বাবার মার খোঁজ নিয়ে তাঁদের কাছে গিয়ে বলবে 'আমি এক ভাগ্যহীনা কিশোরী, আমার জেদের বলি হয়ে আপনাদের ছেলেকে কিছু নর পিশাচের পৈশাচিক কর্মের জন্য অকালে প্রাণ দিতে হয়েছে।' রঞ্জনের কথা মনে হতেই হঠাৎ ডুকরে কেঁদে উঠল শবনম।

সাধুবাবা বললেন—কি হ'ল ! হঠাৎ এত কান্না এলো কেন ?

—আমি আর পারছি না বাবা। এখন আমার মৃত্যু হলেই ভালো হয়।

—মৃত্যু অমোঘ। তাকে কেউ ঠেকাতে পারবে না। অযথা ঐ সব ভেবে মন খারাপ করিস না।

—কিন্তু রঞ্জনকে যে আমি ভুলতে পারছি না বাবা।

—ভুলতেই হবে মা। এই জন্যে তোর চোখে জল? তাকা একবার আমার মুখের দিকে। মার ছেলে মার কাছে গেছে। এই জন্যে তুই কাঁদবি কেন?

—ওকে যে আমার জন্যেই যেতে হ'ল বাবা।

—কেউ কারো জন্যেই যায় না। যে যার নিজের ভবিতব্যে যায়। আসলে তোর চোখ দেখে আমি বুঝতে পারছি তুই ওকে ঘিরে অন্য স্বপ্ন দেখেছিলি। কিন্তু মা! তুই যে ভবানীর মেয়ে। তোকে যে তাঁর কাজ করতে হবে। ও সুখ তোর সইবে কেন? সেই জন্যেই একে একে তোর সব বন্ধন ছিন্ন হয়ে গেল। মা গেছেন, বাবা গেছেন। তোর কিশোর বন্ধুটিও গেল। এই তো ভালো হ'ল রে। কারো জন্যে আর চিন্তা ভাবনা রইল না। এখন প্রাণ ভরে মাকে ডাক।

শবনম তবুও কান্না থামাতে পারল না। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেই চলল।

—ওরে এক কুল হারিয়ে তবে মানুষ আর এক কুল পায়। তোর তো একুল ওকুল দুকুল যায়নি। এই দেখ তোর ওপার ভেসে গেছে এপারে আমি আছি। আমরা আছি। সময়ের ব্যবধানে সব ভুলে যাবি। নে আর দেরী করিস না। জল ঢাল মায়ের মাথায়।

সাধুবাবা অতীতে ডাকাত হলেও এখন তো সাধু। তাই সাধু-জনোচিত ব্যবহার তাঁর। তাছাড়া ডাকাত থাকার সময়েও তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে মা ভবানীর পূজা করতেন। বললেন—ওরে মায়ের ওপর ভরসা রাখ। আমি ভরসা রেখেছিলাম বলেই না আজ আবার

নতুন করে মাকে ফিরে পেলাম, সবাইকে ফিরে পেলাম।

শবনম চোখের জল মুছে উঠে দাঁড়াল। তারপর দেবী ভবানীর মূর্তির মাথায় জল ঢালতে লাগল বালতি বালতি।

পাহাড়িরা দু' একটা ঝাড়ু এনেছিল।

লালচাঁদ ও সাধুবাবা ঝাড়ু নিয়ে নিজেরাই লেগে পড়লেন ঝাঁট-পাট দিতে। আসলে বাইরেটা বন্ধ থাকায় সামান্য একটু ধুলোর আস্তরণ ছাড়া আবর্জনা বিশেষ কিছু জমতে পারেনি। তবে কাঁকড়া বিছের একটা আড়ৎ হয়েছিল। ঝাঁটার খোঁচায় আর জলের ধারায় পালিয়ে গেল সব।

ধোয়া মোছা শেষ হবার পর সবাই চলল ঝর্ণার জলে স্নান করতে।

একে একে স্নান-পর্ব শেষ হতেই শুরু হ'ল দেবীর আরাধনা। সাধুবাবা জোরে জোরে মন্ত্র উচ্চারণ করে পূজা করতে লাগলেন। কাঁসর, ঘণ্টা, কোশা, কুশি, কমণ্ডলু, চন্দনপিড়ি, চন্দনকাঠ সবই ছিল, আর ছিল নৈবেদ্য রাখবার বড় বড় রুপোর থালা। ফল কাটবার জন্য বঁটি, কাটারি, কুড়ুনি সব। লোহার জিনিসগুলোয় তাদের ধর্মে জং ধরেছে। যাইহোক, গাছের পেঁপে কলা পিয়ারা আর কাঁচা পাকা বেল দিয়ে নৈবেদ্য সাজাল শবনম। সাধুবাবা খুঁজে পেতে তাঁর পরিচিত নির্দিষ্ট স্থান থেকে সরাল নামে একপ্রকার সুস্বাদু কন্দ তুলে নিয়ে এলেন। ব্যস শুরু হ'ল ভোগের ব্যবস্থা।

সাধুর বজ্রগভীর অথচ সুললিত কণ্ঠস্বরের মন্ত্রধ্বনিতে ও ঘন্টার শব্দে জায়গাটার পরিবেশই যেন পাল্টে গেল। সাধু মা ভবানীর কণ্ঠে বেশ মোটা করে গাঁথা জবার মালা, বেলপাতার মালা, গুলঞ্চের মালা, ও কলকে ফুলের মালা পরিয়ে একটি গুলঞ্চের মালা শবনমের গলাতে পরিয়ে দিলেন। তারপর এক হাতে দেবীকে ও অপর হাতে শবনমকে পূজা করতে লাগলেন। শবনমের তপ্তকাঞ্চনবর্ণ কপাল রক্ত চন্দনে রাঙিয়ে শিঙায় ফুঁ দিলেন। তারপর বললেন—ওরে

হতভাগী! মায়ের পদতলে তোর ঐ বন্দুকটা আগে রাখ। রেখে প্রণাম কর। তোর এখন পুনর্জন্ম হ'ল। তুই এখন বিশ্বমাতার কন্যা হলি। আদিপুরুষের নাম ধর্ম নিরঞ্জন, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর পুত্র তিনজন। সেই নিরঞ্জনই তোর পিতা মাতা হ'ল। তিনি হিন্দু মুসলমান সব কিছুর ঊর্ধে। অলখ্ নিরঞ্জন। তাঁর কোন ভেদাভেদ নেই। তাঁর কোন জাত নেই।

শবনমের দু'চোখে জলের ধারা। সাধুর কথায় বন্দুকটা দেবীর পদতলে রেখে প্রণাম করল।

সাধু বললেন—এই সেই অভিশপ্ত ও মন্ত্রঃপূত বন্দুক। দেবীর ইচ্ছায় তোর হাতে এসে পড়েছিল। এখন যার জিনিস তার কাছে ফিরিয়ে দে। এই বন্দুকের নলে যে শক্তির উৎস, তাকে ওরা অন্য কাজে লাগিয়েছিল। তাই সেই অস্ত্রে ওরাই মরল। এখন তুই বুঝছিস তো পাগলি, কিসের প্রভাবে তুই একটা সাধারণ মেয়ে অসাধারণ হয়ে উঠেছিলি?

—বুঝলাম।

—এখন এই অস্ত্রে ওদের সব কটাকে নিধন করতে হবে। আগে মা ভবানীকে বল—

—কি বলব?

—কি বলবি? তাই তো রে! কি বলবি বলতো? হ্যাঁ হ্যাঁ। বল, মা আজ থেকে আমার কোন জাত নেই, ধর্ম নেই। আমি ভীষণ প্রতিজ্ঞা করে তোমারই হলাম।

শবনম তাই বলল।

বল, যে সনাতন ধর্ম মানুষকে মানুষ বলে বিচার করে আমি সেই ধর্মে আজ দীক্ষা নিলাম।

সাধুর কথার সঙ্গে সঙ্গে শবনমের ঠোঁটও নড়তে লাগল।

সাধু বললেন—আমি তোকে দেবী বলেই ডাকব। তুই আমাদের মা ভবানী। আর একটা কথা, এখন তো তোর নতুন জাত। তুই

নতুন ধর্ম গ্রহণ করছিস। এখন থেকে আর তুই কখনো মাছ মাংস খাবি না। যদিও আমাদের ধর্মে ও সব নিষিদ্ধ নয় তবুও তুই একটু নতুন করে বেঁচে ওঠ দেখি ?

শবনম বলল—আপনি যা বলবেন আমি তাই করব বাবা।

গুহার বাইরে তখন পাহাড়িরা আনন্দে নৃত্য শুরু করে দিয়েছে। শবনম নিজে হাতে কাঁচা শালপাতায় করে মা ভবানীর প্রসাদ সকলকে বিতরণ করতে লাগল।

কর্মক্লান্ত ক্ষুধার্ত মানুষগুলো গোগ্রাসে খেতে লাগল দেবীর প্রসাদ। নানারকম ফলের সঙ্গে সেই সুস্বাদু কন্দে সকলের ক্ষুধা তৃষ্ণা দূর হল। ক্ষুধাকে জয় করার এবং দীর্ঘ মেয়াদি পরিতৃপ্তির এক অত্যাশ্চর্য উপাদান আছে এই কন্দ মূলে।

শবনম নিজেও খেল। সাধুও খেলেন।

সাধু বললেন—আজ এই ভাবেই শুরু হ'ল। কাল থেকে মায়ের পুজো আরো বেশী করে জাঁকিয়ে হবে। বড় বড় কড়াইতে করে ভোগ রান্না হবে মায়ের। খিচুড়ি ভোগ। রাত্রিবেলা হালুয়া পুরী। সেই ভোগের প্রসাদ আমরা সবাই পেট ভরে এক পংক্তিতে বসে খাবো। আর আমাদের এই মা ভবানী সবাইকে তা পরিবেশন করবে।

লালচাঁদ হেসে বললেন—কিন্তু কালকের মধ্যে অত সরঞ্জাম সংগ্রহ করে উঠতে পারবেন ?

—কেন পারব না লালচাঁদ ? তুমি কি এখনো বিশ্বাস করতে পারছ না আজ রাতের মধ্যেই আমরা আবার আমাদের কেল্লা দখল করব বলে ?

লালচাঁদ হাসলেন। বললেন—ও হ্যাঁ। ভুলে গিয়েছিলাম। আজই তো আমরা কেল্লা দখল করছি। আর ঐ কেল্লার ভেতর তো আমাদের সব কিছুই আছে। অবশ্য যদি ও সব কিছু রেখে থাকে।

—রাখবে রাখবে। ওদের নিজেদের ব্যবহারের প্রয়োজনেই

ওরা রাখবে বা রেখেছে। না রাখলে অত লোকের ভোজন পর্ব চলছে কি করে? সাধু বললেন—আজ রাতের অন্ধকারে শয়তান দুর্জন সিং ভূত দেখবে।

শবনম বলল—শুধু দুর্জন সিং নয়। ঐ মংঘীরামকেও ভূত দেখাতে হবে। বিক্রমের কথা যদি সত্যি হয় তাহলে তো ঐ মংঘীরামের জন্যই আমার আববাজানকে হারিয়েছি আমি। তাছাড়া ও আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।

লালচাঁদ বললেন—সবই তো হ'ল। কিন্তু ঐ কেল্লায় আপনি প্রবেশ করবেন কি করে?

সাধু হাসলেন। বললেন—সেই গোপন পথের সন্ধান তোমরা কেউ জানতে না। আজ জানবে। ঐ মহা শয়তান দুর্জনও জানে না। তোমার লোকেদের বলবে সামনের দিক দিয়ে দুম দাম গুলি গালা ছুঁড়ে ওদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে। আর সেই সুযোগে···।

—সেই সুযোগে?

—আমরা পিল পিল করে গোপন পথ দিয়ে ভেতরে ঢুকব। আজ থেকেই ঐ কেল্লায় আমাদের বিজয় পতাকা উড়বে। আজ রাত থেকে ঐ কেল্লা আর দস্যুপুরী থাকবে না। আমরা ওর ভেতরে যেখানে যত বন্দী আছে সবাইকে মুক্তি দিয়ে দেবো। আর কাল প্রভাত সূর্যের সঙ্গে সঙ্গে তোমরা তোমাদের ঐ সব জঘন্য পোষাক পরিচ্ছদ ত্যাগ করে গেরুয়া পরবে।

—আমরা কি তাহলে দস্যুবৃত্তি ছেড়ে দেবো সর্দার?

—হ্যাঁ। কি হবে মানুষ খুন করে? এত খুন জখম তো করলে জীবনে, শান্তি পেলে কি? ঐ কেল্লা দখল করতে পারলে আমাদের আর কোন অভাব থাকবে না। তখন মা ভবানীর সেবা পূজা করে সুখে শান্তিতে থাকতে পারব আমরা। এই কেল্লার নাম হবে ভবানী মন্দির।

লালচাঁদ বললেন—যা আপনি বলবেন তাই হবে সর্দার। তবে

অদ্যই হোক আমাদের মানুষ মারার শেষ রজনী।

এমন সময় একজন লোক এসে লালচাঁদের কানে কানে ফিস ফিস করে কি যেন বলতেই লালচাঁদ চোখ লাল করে দূরের দিকে তাকালেন। তারপর কাউকে কোন কথা না বলে হন হন করে এগিয়ে গেলেন লোকটির সঙ্গে।

বেশ কিছু দূর যাবার পর এক নৃশংস দৃশ্য দেখতে পেলেন লালচাঁদ। সে দৃশ্য বড় মর্মান্তিক এবং রোমহর্ষক। দেখেন একজন লোকের দু'চোখ অন্ধ করে তাকে একটি গাছের সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়েছে। চোখ দুটো খুবলে বার করে নেওয়ায় রক্তে ভেসে যাচ্ছে সারা শরীর। মুখ দেখে তাকে আর চেনবার উপায় নেই সে কে। লালচাঁদ বললেন—কে তুমি ?

—আমি যোগীন্দর।

—যোগীন্দর ! তোমার এই অবস্থা কে করল ?

—জানি না। আমি কোন কিছু বুঝে ওঠার আগেই কে যেন পিছন দিক থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে আমার চোখ দুটো খুবলে বার করে নিল। তারপর এইভাবে বেঁধে রাখল আমাকে। আমি কত বললাম ওকে, এ শাস্তি আমার প্রাপ্য নয়। আমাকে একেবারে মেরে ফেলো। কিন্তু সে কথা ও কিছুতেই শুনল না।

—তোমার পরিচয় ?

এমন সময় ঝোপের আড়াল থেকে যে বেরিয়ে এলো তাকে দেখেই চমকে উঠলেন লালচাঁদ—একি বিক্রম ! তুমি এখানে ?

—এই শয়তানটার পরিচয় দেবো বলে লুকিয়ে বসেছিলাম।

—ওর এই দশা কে করেছে ? তুমি ?

—হ্যাঁ। আমাকে হত্যা করবার জন্য এই লোকটাকে কাজে লাগিয়েছিল শয়তানটা। অবশ্য এতটা নির্দয় আমি হতাম না ওর ওপর, যদি না ও আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করত।

—কি রকম বিশ্বাসঘাতকতা ?

—আমি ওকে চিনে ফেলার সঙ্গে সঙ্গেই সাবধান করে দিই এবং বলি ওকেও আমার মতো দলত্যাগী হতে। ও প্রথমটা রাজি হয়নি। পরে অবশ্য অনেক বোঝাতে রাজি হয়। কিন্তু তখন বুঝিনি ওর এই রাজি হওয়াটা অভিনয় ছাড়া কিছু নয়। আমি ওকে বিশ্বাস করে সঙ্গে নিয়ে পথ চলছি এমন সময় দেখি পাহাড়ি বস্তীর হিংলাজ সর্দারের পোষা কুকুরটা ভয়ানক উত্তেজিত হয়ে ছুটতে ছুটতে কি একটা যেন মুখে নিয়ে বস্তীর দিকে যাচ্ছে। আমি যেই সেদিকে তাকিয়ে একটু অন্যমনস্ক হয়েছি অমনি এই শয়তানটা আমাকে পিছন দিক থেকে ধাক্কা মেরে পাহাড়ের খাদে ফেলে দেয়।

—তারপর ?

—ভগবান রক্ষে যে পড়ে গিয়েও একটা শক্ত মোটা চীহড়লতাকে আঁকড়ে ধরে বেঁচে গেলাম। আমার চিৎকার শুনে এবং পড়ে যাওয়া দেখে ও ধরেই নিয়েছিল আমি খাদে পড়ে মরে গেছি। কিন্তু আমি যে নিজেকে বাঁচিয়ে নিয়ে আবার ওকে ফলো করব তা ও ভাবতেও পারেনি। এই শয়তানটা চিরকাল নারী নির্য্যাতন, শিশু নির্য্যাতন করে তাদের চোখ খুবলে নিত। তাই আমিও ওর অন্তিম সময়ে আমার নিজস্ব আদালতের বিচারে ওকে ঐ শাস্তিই দিলাম।

—ঠিক করেছ।

লালচাঁদ এবার লোকটির কাছে এগিয়ে গিয়ে ওর চুলের মুঠি ধরে বললেন—বিক্রম যা বলল তা ঠিক ?

লোকটি নীরব।

—তোমার নীরবতাই জানিয়ে দিচ্ছে ওর কথাই সত্য। যাক। তোমার উপযুক্ত শাস্তি তুমি পেয়েছ। এখন তোমার নিয়তিই তোমার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নেবে। এখন তুমি পাহাড় থেকে পড়ে মরবে কি পুলিশের গুলি খাবে সেটা নির্ভর করবে তোমার ভবিতব্যের ওপর। বলে একজনকে বললেন—দে, এর বাঁধনটা খুলে দে।

একজন লোক বাঁধন খুলে দিল।

বাঁধন খুলে দিতেই দু'হাতে চোখ ঢেকে সেখানেই বসে পড়ল লোকটি।

লালচাঁদ, বিক্রমজিৎ এবং তাঁর অনুচরকে সঙ্গে নিয়ে আবার যথা স্থানে ফিরে এলেন।

হিংলাজ সর্দারের পোষা কুকুরটা আসায় সবাই স্তব্ধ হয়ে গেল। সবচেয়ে বিস্ময়কর যেটা হ'ল তাতে সবাই একটা আশার আলো দেখতে পেল। ঐ অগ্নিকাণ্ডর পর থেকে কুকুরটা নিখোঁজ হওয়ায় সবাই প্রায় ধরেই নিয়েছিল ওটা পুড়ে মরেছে। কিন্তু তার এই সুস্থ শরীরে ফিরে আসা এবং তার এই মুখের বস্তুটি চমক লাগিয়ে দিল সকলকে।

কুকুরটা ফিরে এসেই শবনমের পায়ের কাছে কি যেন একটা রেখে কুঁই কুঁই করে ছটফট করতে লাগল।

কী ওটা? কি রাখল?

শবনম সেটা কুড়িয়ে নিয়েই চেঁচিয়ে উঠল—কোথায়? কোথায় পেলি এটা? আমাকে তুই নিয়ে চল সেখানে। আমার বন্দুক! বন্দুকটা কেউ আমাকে এনে দাও। মা ভবানীর মন্ত্রপূত বন্দুক। যার নিশানা ব্যর্থ হবার নয়।

সাধু বললেন—কি হ'ল মা! কি ওটা? কি পেয়ে তুই এমন উত্তেজিত হয়ে উঠলি? আমাকে বল?

—সে মরেনি বাবা। সে নিশ্চয়ই বেঁচে আছে। কেউ কোথাও লুকিয়ে রেখেছে তাকে। এই দেখুন তার রুমাল। এই রুমাল মুখে নিয়ে ও যখন আমার কাছে এসেছে আর বারে বারে ছটফট করছে তখন ও নিশ্চয়ই জানে সে কোথায় আছে। আমি এখনি তার খোঁজে যেতে চাই। আর দেরি করলে হয়তো তার আরো বিপদ হবে।

সাধু ডাকলেন—লালচাঁদ !

—বলুন সর্দার।

—একে মদত করো। তুমিও সঙ্গে যাও। পারলে সঙ্গে নাও আরো দু'একজনকে। আমি এদিকটা দেখছি। তুমি ওদিকে দেখো। দেবীকে একা ছাড়া ঠিক হবে না।

লালচাঁদ তক্ষুনি তাঁর দলের সবাইকে ডেকে নিলেন। দুজন রইল দুর্গ পাহারায়। আর রইল পাহাড়িয়া মানুষগুলো। ওরা এমনভাবে দুর্গ ঘিরে রইল যাতে ওদিক থেকে কেউ গুলিগালা ছুঁড়লে এদিকের কারো গায়ে না লাগে আবার ওদিকের দুর্গ থেকেও কেউ বেরোতে গেলে এদিকের গুলির মুখে পড়ে। এই অবরোধ এমনই যে দুর্গ থেকে বেরুতে না পারলে খাদ্য এবং পানীয় জলের অভাবে তিল তিল করে শুকিয়ে মরবে ওরা। ঘুঘুরা এখন নিজেদের ফাঁদে নিজেরাই পড়েছে।

শবনম, লালচাঁদ, বিক্রমজিৎ তিনজনে তিনটে ঘোড়ায় চেপে বসল। বাকিরা চলল পদব্রজে। সবার আগে চলল কুকুরটা। আর কুকুরের নির্দেশিত পথে ওরা সকলে।

দুপুর গড়িয়ে বিকেল এবং বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যে হ'ল।

পাহাড়ের ঢালু পথে নামতে নামতে ভীষণ জঙ্গল পার হয়ে এক-সময় ওরা এক প্রাসাদোপমো বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল।

দরোয়ান পাহারা দিচ্ছিল গেটে।

বিক্রম ওর কাছে গিয়ে বুকে বন্দুকের নল ঠেকিয়ে বলল—দরোয়াজা খুলো।

দরোয়ান বলল—হুকুম নেহি।

শবনম বলল—না খুললে বিপদ হবে। খোলো দরোয়াজা।

দরোয়ান বলল –শেঠজী হামকো নোকরি সে নিকাল দেগা।

লালচাঁদ বললেন—দরজা না খুললে আমরাও তোমাকে জিন্দগী থেকে নিকাল দেবো।

দরোয়ানটি সঙ্গে সঙ্গে একটা কলিংবেলের সুইচ টিপে দিতেই চারিদিক থেকে বিপজ্জনক ঘণ্টি বাজতে শুরু করল।

বিক্রমের বন্দুক গর্জন করে উঠল 'গুড়ুম'।

রক্তাক্ত কলেবরে লুটিয়ে পড়ল দরোয়ান।

ওরা এবার নিজেরাই দরোয়ানের পকেট থেকে চাবি নিয়ে গেট খুলে ফেলল। তারপর হৈ হৈ করে ঢুকে পড়ল ভেতরে। আর ঢোকামাত্রই দেখল দশ-বারোজন যোদ্ধা স্টেনগান উঁচিয়ে লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হয়ে অপেক্ষা করছে ওদের জন্য।

এরা ঢুকতেই ওরা বলল—জলদি বাহার নিকালো। নেহি তো···।

লালচাঁদ বললেন—ও লেড়কা কাঁহা হ্যায় ?

শবনম বলল—কাঁহা হ্যায় ও লেড়কা ?

—কাঁহা হ্যায় দেখোগে ? বলার সঙ্গে সঙ্গেই ওরা গুলি চালানো শুরু করল।

বিক্রম, লালচাঁদ এবং শবনম তিনজনেই ছিটকে পড়ল গুলি খেয়ে। ঘোড়াগুলো প্রচণ্ড আর্তনাদ করে শূন্যে দু'পা তুলে লাফিয়ে উঠল একবার। আর সঙ্গে সঙ্গেই লালচাঁদের লোকেরা উঁচু পাঁচিলের ওপর থেকে গুলির পর গুলি চালিয়ে সেই আক্রমণ-কারীদের সব কটাকে মাটিতে লুটিয়ে দিল। তারপর পাঁচিল থেকে লাফিয়ে পড়ে যেন গেটটা বন্ধ করে দিল একেবারে। লাফ দিয়ে ছুটে এসে বিক্রম, লালচাঁদ আর শবনমকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে বারান্দার নীচে শোয়ালো।

বিক্রমের বুক গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে গেছে। ওর আর বাঁচার আশা নেই।

লালচাঁদও গুরুতর রকমের জখম হয়েছেন।

শবনমের বাঁ কাঁধে গুলি লেগেছে।

অসহ্য যন্ত্রণায় ছটফট করছে সকলে।

শবনম এক হাতে ওর বাঁ কাঁধটা চেপে ধরেছে। ঝর ঝর করে লাল রক্ত ঝরে পড়ছে সেখান দিয়ে। যন্ত্রণা এত প্রবল যে মনে হচ্ছে এখুনি হার্টফেল করবে বুঝি। গায়ে যেন জ্বর আসছে। এই অবস্থায় বেশিক্ষণ থাকা ঠিক নয়। এখুনি গুলি বার করতে না পারলে পরে ভয়ানক ক্ষতি হয়ে যাবে। তখন আর কোন কিছু করাই সম্ভব হবে না।

একজন লোক লালচাঁদকে ঘোড়ায় তুলে সঙ্গে সঙ্গেই স্থান ত্যাগ করল। যদি কোন ডাক্তারের কাছে গিয়ে অস্ত্রোপচার করে কোন রকমে মানুষটাকে বাঁচানো যায়।

আর একজন শবনমকে বলল—চলুন দেবীজী। আপনারও গা থেকে ঐ বুলেটগুলো বার করা দরকার। নাহলে খারাপ হয়ে যাবে। কোন ডাক্তারখানায় গিয়ে ওগুলো বার করে দু' একটা সুই টুই নিয়ে নেবেন।

শবনম বলল—আগে যে কাজে এসেছি সেই কাজ করি। তোমরা সারা বাড়ি তন্ন তন্ন করে দেখো কোথায় লুকিয়েছে ওরা ছেলেটাকে।

এই ডামাডোলের মধ্যে ওরা কেউ নজরই দেয়নি কুকুরটার দিকে। কুকুরটা তখন উঠোনময় ছুটোছুটি করে এক জায়গায় গিয়ে প্রচণ্ড রকমের চিৎকার করতে লাগল। ঘেউ। ঘেউ ঘেউ। ঘেউ। ঘেউ ঘেউ—উ—উ—উ।

শবনম সেই অবস্থাতেই ছুটে গেল সেখানে। গিয়ে দেখল একটা আংটাওয়ালা কাঠের ডালা উঠোনের এক প্রান্তে নীচের একটি গর্ত মুখে ঢাকা দেওয়া আছে। বলল—নিশ্চয়ই এর মধ্যে কোন গোপন ঘর বা ঐ জাতীয় কিছু আছে। আমার মন বলছে এখানেই আছে রঞ্জন।

একজন লোক শবনমকে সরিয়ে এনে এক জায়গায় বসাল। বলল—আপনি আহত। বেশি পরিশ্রম করবেন না বা উত্তেজিত

হবেন না। আমরা দেখছি ওর ভেতরে কি আছে না আছে।

শবনম বলল—আমিও নামব ওর ভেতরে।

—তাহলে আমাদের রক্ষা করবে কে? সবাই গেলে কি হয়? এই বলে দুজন লোক সেই ডালা তুলে যেই না ভেতরে নামতে যাবে অমনি দোতলার বারান্দা থেকে দুটো বুলেট যেন হাওয়ায় ছিটকে এসে শেষ করে দিল দুজনকে।

বাকি দুজন তখন একটু নিরাপদ দূরত্ব থেকে সেই বারান্দা লক্ষ্য করে গুলি ছোটাতে লাগল।

একজন চেঁচিয়ে বলল—দেবীজী! তুম্ হঠ যাও হিঁয়াসে। ইয়ে আদমি বহুৎ খতরনক হ্যায়। তুম আভি কোঈ ডাক্তারকা পাশ চলা যাও। নেহি তো বহুৎ দের হো যায়েগা।

শবনম একটু সময় কি যেন ভাবল। তারপর লাফিয়ে বসল একটা ঘোড়ার পিঠে।

ওদিক থেকে হঠাৎ একজন চিৎকার করে উঠল—ইধার মাৎ আও দেবীজী। ও শয়তানকা বাচ্চা উপর সে গোলি চালায়গা।

শবনম তখন আবার সেই আগের মতো প্রেতিনী হয়ে উঠল। বাঁ কাঁধের যন্ত্রণার কষ্ট ভুলে বন্দুকটা বাগিয়ে ধরে ঘোড়ায় চেপেই একেবারে বাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়ল।

ওর ঐ রণরঙ্গিনী মূর্তি দেখে যে যেদিকে পারল পালাল। যে বাধা দিতে এলো সেই পড়ল গুলির মুখে।

ঘোড়া তখন ঘরের ভেতর ঢুকে প্রসস্ত সিঁড়ি বেয়ে একেবারে দোতলায় উঠে পড়ল।

দুজন লোক তখন বারান্দার থামের আড়াল থেকে গুলির জবাব গুলিতে দিচ্ছে।

শবনম ঘোড়া থেকে না নেমেই পিছন দিক থেকে গুলি করল লোক দুজনকে।

গুলি খেয়ে দুজনে দুদিকে ছিটকে পড়ল আর্তনাদ করে।

শবনম বারন্দায় এসে হাত নেড়ে ওদের জানাল আর কোন ভয় নেই। এবার তোমরা বিপদমুক্ত।

লোকগুলো এবার নির্ভয়ে নীচের উঠোনে ঘোরা ফেরা করতে লাগল।

দুজন লোক সেই কুকুরের চিৎকারের সূত্র ধরে তরতর করে নীচে নেমে গেল। কিন্তু না। সেখানে তখন ফাঁকা ঘর। কেউ কোথাও নেই।

শবনম দুজন লোককে ওপরে ডেকে প্রতিটি ঘর তন্ন তন্ন করে খুঁজল। কিন্তু না। কেউ কোথাও নেই। একটি ঘরের দরজা শুধু ভেতর থেকে বন্ধ। ওরা আঘাতের পর আঘাত করেও যখন সে দরজা খুলতে পারল না তখন একজন লোক নীচে নেমে একটা শাবল যোগাড় করে এসে তাইতে চাড় দিয়ে ভেঙে ফেলল দরজাটা।

সেই ঘরের ভেতরে বউ ছেলে মেয়ে নিয়ে শেঠ মংঘীরামজী থর থর করে কাঁপছিলেন।

শবনমকে দেখেই চিৎকার করে উঠলেন মংঘীরাম—নেহি নেহি নেহি। মুঝে মাৎ মারো দেবীজী। মুঝে মাৎ মারো।

শবনম বলল—বড্ড প্রাণের মায়া যে। শয়তান। লোকের সর্বনাশ করার সময়, ট্রেন ওল্‌টানোর সময় এই প্রাণে খুব ফুর্তি হয় না? এখন তোর প্রাণ নিয়ে আমি ফুটবল খেলব।

—ম্যায় গোড় পাকড়তি হুঁ দেবীজী! মুঝে মাফ করো।

—আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলি কেন? কি বলে পালিয়ে এসেছিলি ওখান থেকে? কোন সাহসে আমার সঙ্গে বেইমানি করলি, বল?

—মুঝে মাফ কর দো। মেরা গলতি হো গিয়া।

—ফের ঐ এক কথা?

মংঘীরামের বউ ছেলে মেয়ে সবাই তখন ছুটে এসে শবনমের পা দুটো জড়িয়ে ধরল। বলল—উনকো মাৎ মারো দেবীজী। হাম

সব অনাথ হো যাউঙ্গা।

শবনম বলল—এই কথা বলতে সরম লাগছে না তোমাদের? এই পাপীর পাপের পয়সা নিয়ে দিব্যি তো সুখভোগ করছিলে? এখন অনাথ হয়ে যাবার শোকে নাকি কান্না কাঁদছ? কেন তোমরা বাধা দাওনি ওকে ঐসব কাজ করতে?

মংঘীরামের বউ ডুকরে কেঁদে উঠল।

শবনম ওর গলার হারটা এক টানে ছিঁড়ে দিয়ে বলল এ হার কার?

—মেরা।

—তোমার? না ট্রেন ডাকাতি করে পাওয়া লুটের মাল? সত্যি করে বলো?

—ও হার মেরা।

শবনম সেটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলল—তোমরা একটু ওপাশের ঘরে যাও। এই শয়তানটার সঙ্গে আমার একটু বোঝাপড়া আছে।

—নেহি। ম্যায় নেহি যাউঙ্গা। তুম উনকো মার ডালোগে।

শবনম ওর লোকেদের বলল মংঘীরামের স্ত্রী এবং ছেলে-মেয়েকে অন্য ঘরে সরিয়ে দিতে।

কিন্তু ওরা এমনভাবে কান্নাকাটি করতে লাগল যে তা আর সম্ভব হ'ল না। অগত্যা ওরা মংঘীরামকেই টেনে বার করতে গেল হিড় হিড় করে।

মংঘীরাম ছুটে গিয়ে সিন্দুক খুলে গাদা গাদা নোটের বান্ডিল ছুঁড়ে দিতে লাগল শবনমের দিকে - ইয়ে লো। তুম মুঝে এক লাখ দেনে কো লিয়ে বোলা থা, ইয়ে লো দশ লাখ রুপয়া। সোনাদানা যো কুছ হ্যায় লে লো। লেকিন মুঝে জিনে দো।

শবনম তখনও ঘোড়ার পিঠেই চেপে আছে। একবারও নামেনি। মংঘীরামের কথা শুনে হো হো করে হেসে উঠে বলল—ও মুঝে নেহি চাইয়ে মংঘীরাম।

—তো ক্যা চাহিয়ে তুমকো ?

—হামারা আব্বাজান কা জিন্দগী ঔর রঞ্জনকো চাহিয়ে।

—ও লেড়কা মিল যায়ে গা। লেকিন আব্বাজান কি বারেমে ম্যায় কুছ নেহি জানতা।

—তো লেড়কা কো আপস দে দো।

—ও মিট্টিকা অন্দর হ্যায়।

—জিন্দা না মুর্দা ?

—জিন্দা। আন্ডার গ্রাউন্ডমে হ্যায় ও।

—চলো নিকালো।

মংঘীরাম ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামল। শবনমও ঘোড়া নিয়ে নামতে লাগল নীচে। তারপর ওরা সেই কাঠের আংটাওয়ালা পাটাতনটার কাছে যেতেই শবনম বলল—ইস্‌কো অন্দরমে কোঈ নেহি হ্যায়। হাম সব পহলেই দেখা।

—হ্যায়। লাস্ট স্টেপিং পর যানে কা বাদ এক সুইচ বোর্ড মিলেগা। হুঁয়া তিন নম্বরমে পুস করনে সে এক অলগ কামরা কা ওয়াল হট যায়ে গা। রঞ্জনবাবু হুঁয়া পর হ্যায়।

—ঠিক হ্যায়, লেকে আও।

মংঘীরাম বলল—আপ ভি আইয়ে।

শবনম ঘোড়া থেকে নেমে যেই না ভেতরে ঢুকতে গেল অমনি লোক দুজন বাধা দিল ওকে। বলল—আপ মাৎ যাইয়ে দেবীজী। উনকো যানে দিজিয়ে। হাম দোনো যাউঙ্গা ও শয়তান কা সাথ।

এদিকে 'জলদি আইয়ে' বলে মংঘীরাম সেই কাঠের পাটাতনের ডালা তুলে আণ্ডার গ্রাউণ্ডে নেমেই ডালাটা ফেলে ভেতর থেকে লক করে দিল।

শবনম এবং তার লোকেরা বারবার চেষ্টা করতে লাগল সেটাকে ভেঙে ফেলবার কিন্তু পারল না।

বাইরে তখন সাইরেনের শব্দ।

শবনমের লোকেরা চেঁচিয়ে উঠল—পুলিশ ! পুলিশ ! জলদি ভাগো হিঁয়াসে। দেবীজী চলা আও।

কিন্তু যাবে কোন দিকে ?

একজন বলল—আমরা এর ভেতরে ঢুকেই বাইরে পালাবার রাস্তা দেখে এসেছি। ঐ পিছন দিকে একটা তালাওয়ের পাড় দিয়ে রাস্তা। উধার সে ভাগো।

ওরা পিছনের দরজা দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে চোখের পলকে উধাও হয়ে গেল।

মেন দরজায় তখন ঘন ঘন পুলিশের করাঘাত। পুলিশের একজন লোক তখন একটি গাছের ডালে উঠে পাঁচিল উপকে ঠিক যেভাবে লালচাঁদের লোকেরা এসেছিল সেইভাবে ভেতরে ঢুকল। তারপর এদিকের বন্ধ দরোজাটা খুলে দিতেই ভ্যান ভর্তি পুলিশ হৈ হৈ করে ঢুকল ভেতরে।

পুলিশকে ভেতরে ঢুকতে দেখেই মংঘীরামের বাড়ির চাকর বাকর সহ যে যেখানে ছিল ছুটে এলো। ওর বউ ছেলে মেয়েরাও ছুটে এসে বলল—আপ লোগোনে ইতনা দেরি কিঁউ কিয়া ? ও ডাকু আকে হামারা সর্বনাশ কর দিয়া।

পুলিশ অফিসার বললেন—থামুন। আপনারা যে কি চীজ আমি জানি। দিনের পর দিন হাজার হাজার লোকের সর্বনাশ করে বেড়াবেন আর আপনাদের সর্বনাশ কেউ করতে এলে চেঁচামেচি করবেন, এ কিরকম কথা ?

মংঘীরামের স্ত্রী বললেন—দেখিয়ে তো কিতনা আদমি কো মার ডালা ও ডাকুনে।

—এই সব লোক আপনাদের ?

—জী হাঁ।

—আমি তো এদেরকেই ডাকাত মনে করেছিলাম। এত

স্টেনগান বন্দুক এরা পেল কি করে ?

মংঘীরামের স্ত্রী এবার চুপ করে রইলেন।

পুলিশ অফিসার বললেন—শুনুন, দুর্নীতির অভিযোগে এখানকার এস পিকে বদলি করা হয়েছে। নতুন এস পি হুকুমৎ সিং অত্যন্ত কড়া লোক। আপনাদের রামরাজত্বের অবসান একেবারেই হয়ে গেছে ধরে নিতে পারেন। আর আমিও এখানে নতুন এসেছি। শুধু আগের এস. পি. সাহেবের জন্যে কিছু করতে পারছিলাম না। এখন বলুন শেঠজী কোথায় ?

—ডাকুরাণী উসকো লেকে ভাগা।

—ডাকুরাণী ?

—হাঁ হাঁ। কাঁহাসে এক বদমাশ লেড়কি ফুলন দেবী বনকে আয়া। ও সবকো মারতা।

—কোথায় থাকে সে ?

—ঐ পাহাড় পর যো হিন্দোলগড় হ্যায়, হুঁয়াকা বস্তীমে।

—হিন্দোলগড় ! ও তো আর এক জায়গা। যত সব কুখ্যাত সমাজবিরোধীদের ঘাঁটি একটা। ওর ধারে কাছে গেলেই তো শুনেছি গুলি করে। আমি অনেকবার এস. পি. সাহেবকে বলেছিলাম ঐ পুরনো কেল্লায় রেড করতে। কিন্তু ওনার কি যে স্বার্থ ছিল তা কে জানে, ঐ কেল্লার কথা উঠলেই তেড়ে একটা ধমক দিতেন।

পুলিশের লোকেরা তখন ডেডবডির গাদা করেছে।

তরুণ অফিসার চারিদিক ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ সেই কাঠের ডালার কাছে এসে বললেন—এটা এখানে কি ?

মংঘীরামের স্ত্রী বললেন—উধার কুছ নেহি। ও আণ্ডার গ্রাউণ্ড কা দরোয়াজা।

—তোড়ো। হাম দেখেঙ্গে। কনস্টেবল ! তোড়ো ইস ডালে কো।

পুলিশের লোকেরা সঙ্গে সঙ্গে এর ডালা ভেঙে ফেলল। তারপর টর্চের আলো ফেলে ভেতরে ঢুকেই আর যাবার পথ পেল না।

পুলিশ অফিসার বললেন—ব্যস। এইটুকু নামার জন্যে এত কাণ্ড ?

মংঘীরামের স্ত্রী বললেন—হাম তো পহলেই আপকো বোলা ইসকো অন্দরমে কুছ হ্যায়ই নেহি। আপ তো শুনা নেহি মেরি বাত।

—কিন্তু একটা কথা আমি ভেবে পাচ্ছি না এর ভেতরে কিছু যদি না-ই থাকবে তাহলে এর ডালাটা ভেতর থেকে লক করেছিল কে ?

মংঘীরামের স্ত্রী এবার জবাব দিতে পারলেন না।

পুলিশ অফিসার বললেন—শুনুন। এ যাত্রা আপনাদের বাঁচবার কোন রাস্তাই আমি দেখতে পাচ্ছি না। এখনো বলছি যদি নিজেদের মঙ্গল চান তো পুলিশের সঙ্গে সহযোগিতা করুন।

—হাম আপকো বহুৎ রুপিয়া দেগা। আপ হামারা পতিকো বাঁচাইয়ে।

পুলিশ অফিসার বললেন—একটা কথা জেনে রাখুন, পুলিশের মধ্যে অনেক খারাপ লোক যেমন আছে। তেমনি ভালো লোকও অনেক আছেন। আমি মধ্যবিত্ত বাঙালির ছেলে। এই বিদেশে পুলিশের চাকরি করতে এসেছি। আমার অনেক অভাব আছে। তাই বলে টাকার লোভে কোন বোর্ন ক্রীমিন্যালকে আমি প্রশ্রয় দেবো না। আপনাদের ঐ পাপের টাকায় হাত দেবো না আমি। আমার সন্তান এই পবিত্র ভারতভূমির মাটিতে ঘুষের টাকায় পালিত হয়ে হাওয়া গাড়ি চেপে ঘুরে বেড়াবে এই নীচতা আমার রক্তে নেই। জনগণের আত্মসাৎ করা টাকা আমি সরকারের হাতেই তুলে দেবো। কিন্তু এখন বলুন শেঠজী কোথায় বা এর ভেতরে ঢোকার সোজা পথ কোন দিকে ?

কথা বলতে বলতেই স্যুইচ বোর্ডটা নজরে পড়ে গেল

অফিসারের। তিনটে স্যুইচ। দুটো ফলস্। একটা আসল। তৃতীয়টায় হাত পড়তেই দু'ফাঁক হয়ে গেল দেয়ালটা।

পুলিশ অফিসারের নির্দেশে সকলে হৈ হৈ করে ঢুকে পড়ল ভেতরে।

পর পর অনেকগুলি ঘর। প্রতিটি ঘরের দেওয়ালের পেরেকে চাবি আটকানো। সেই চাবি নিয়ে দরজা খুলতেই বিস্ময়ের পর বিস্ময় দেখা দিতে লাগল। একটি ঘরের ভেতর থেকে উদ্ধার হ'ল গাঁজা চরস ইত্যাদি কিছু মাদক দ্রব্য। আর একটি ঘর থেকে দশ বারো জন সুন্দরী মহিলাকে উদ্ধার করা হ'ল।

একটি ঘরে ছিল ট্রেন ডাকাতি করে পাওয়া প্রচুর স্বর্ণালংকার।

আর একটি ঘরে একশো টাকার জাল নোটের হাজার হাজার বাণ্ডিল।

শেষ ঘরটিতে ছিল হাত পা বাঁধা অবস্থায় এক কিশোর।

পুলিশ অফিসার গিয়ে তার বাঁধন খুলে দিয়ে বললেন—বাঙালির বাচ্চা বলে মনে হচ্ছে! কি নাম তোমার?

—আমার নাম রঞ্জন। আমি কোথায়?

—তুমি এখন কুখ্যাত মংঘীরাম শেঠের গুপ্ত কক্ষে আছো।

—শবনম কোথায়? সে কেমন আছে? তার কোন ক্ষতি হয়নি তো?

—শবনম কে?

—বলব বলব। সব বলব। আগে আমাকে একটু জল খেতে দিন।

পুলিশ অফিসার তাঁর সঙ্গের কনস্টেবলদের বললেন—যাও একে বাইরে বার করে নিয়ে যাও। শেঠের বাড়ির ভেতরে ঢুকে ভালো জল খাইয়ে একটু সুস্থ হতে দাও। তারপর ওর কথা শোনা যাবে।

ওরা রঞ্জনকে বার করে নিয়ে গেলে পুলিশ অফিসার মংঘীরামের স্ত্রীকে বললেন—আপনার স্বামী কোথায়?

—কোন জানে ও কাঁহা হ্যায়।

—ঠিক সে বোলিয়ে আপকা পতি মংঘীরাম কুত্তা কাঁহা হ্যায় ? কিধার সে ভাগা ও শয়তান, মুঝে বাতাইয়ে।

মংঘীরামের স্ত্রী এবার রীতিমতো ভয় পেয়ে একটি দেয়ালের নীচের দিকের স্যুইচ টিপতেই দেয়ালটা ওপর দিকে উঠে গেল। আর তখনই দেখা গেল একটি ছোট্ট ঘরের মেঝেয় বসে মংঘীরামজী থর থর করে কাঁপছেন।

পুলিশ অফিসার বললেন বাঃ শেঠজী। বেশ ভালো একটা নিরিবিলি তপস্যার জায়গা বেছে বার করে নিয়েছেন দেখছি। তা আর কেন ? এবার বেরিয়ে আসুন ওর ভেতর থেকে।

—হাম জানে নেহি শেখতা স্যার। হামারা ব্লাড প্রেসার জায়দা হো গিয়া।

—ও এক্ষুনি রুলের গুঁতোয় কমে যাবে। বেরিয়ে আসুন।

—হাম আপকো বহুৎ রুপইয়া দেগা। হামকো ক্ষমা কর দিজিয়ে সাব।

পুলিশ অফিসার বললেন—এই, এর হাতে হ্যান্ড কাপ লাগা তো কেউ।

হ্যান্ডকাপের নামে তীব্র একটা আর্তনাদ করে উঠলেন মংঘীরাম।

—নাউ, ইউ আর আন্ডার অ্যারেস্ট। এখন বলুন আপনার এই ধর্মপুরীতে কোথায় কি লুকানো আছে ?

কনস্টেবলরা সঙ্গে সঙ্গে মংঘীরামের হাতে হাতকড়া পরাল। তারপর সবাই মিলে টেনে হিঁচড়ে বাইরে বার করে আনল তাকে।

মংঘীরামের স্ত্রী যখন বুঝলেন কোন প্রলোভনেই এই তরুণ বাঙালি পুলিশ অফিসারকে বশে আনানো যাবে না তখন অকথ্য ভাষায় গালাগালি শুরু করে দিলেন। অবশ্য তাতে লাভ হ'ল না কিছুই। পুলিশ অফিসারের কড়া ধমক ছাড়া কিছুই জুটল না তাঁর বরাতে।

বাইরে এসে মংঘীরাম হঠাৎ নিজ মূর্তি ধরলেন। বললেন—বাংগালি বাবু! আপ নয়া অফিসার মালুম হোচ্ছে। আপনি কিন্তু ভীমরুলের চাকে হাত দিয়ে ফেলেছেন। আমার নজরানা আপনি নিলেন না লেকিন আপনার হয়তো জানা নেই যে আপনার এস, পি বাবা আমার জিগরি দোস্ত। কোন হাজতেই আপনি আমাকে আটকে রাখতে পারবেন না। যে রুপিয়া আপনি আপনার অনেষ্টি দেখাতে গিয়ে নিলেনই না ঐ রুপিয়া আমাকে ছাড়িয়ে আনবে আর আপনাকে ট্রান্সফার করিয়ে দেবে অনেক দূরে। এখনো ভেবে দেখুন কি করবেন। আমি এখনো আপনার সঙ্গে দোস্তি করতে রাজি আছি।

তরুণ পুলিশ অফিসার তখন আর থাকতে না পেরে সবুট একটা লাথি দড়াম করে মেরে বসলেন মংঘীরামের পেটে।

মংঘীরাম লাথি খেয়ে একবার 'ঘ্যাক্' করে মুখ দিয়ে এক বিটকেল শব্দ বার করে বসে পড়লেন।

পুলিশ অফিসার বললেন—তোমার হয়তো জানা নেই বাবা নাদুসরাম, যে···

—জী ম্যায় নাদুসরাম নেহি। মংঘীরাম।

—তুমি নাদুসরামই। তোমার হয়তো জানা নেই যে ঐ ভয়াবহ ট্রেন দুর্ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই এবং আরো অন্যান্য অনেকগুলি অভিযোগে এখানকার এস. পি সাহেব হঠাৎ বদলি হয়ে গেছেন। তাঁর জায়গায় এখন এসেছেন হুকুমৎ সিং। তোমার সম্বন্ধে সব কিছুই তিনি শুনেছেন। এমন সময় টেলিফোনে চোরের ওপর বাটপাড়ি হচ্ছে খবর শুনে আমি লোকজন নিয়ে তৈরী হয়ে ছুটে এসেছি। এস. পি. সাহেবের আদেশ, আমি এখান থেকে ফিরে যাবার সময় যেন তোমার গায়ের চামড়াটা ছাড়িয়ে নিয়ে যাই। সেটা কি ভাবে নিলে তোমার সুবিধে হয় চট করে বলে ফেলো দেখি?

মংঘীরাম থর থর করে কাঁপতে লাগলেন।

—তোমার গোডাউন কোথায়?

—আমার কোথাও কিছু নেই স্যার। যা কুছু সব এইখানেই আছে।

—মিথ্যে কথা।

হুজুর! মংঘীরাম ধার্মিক লোক। মিথ্যা কোথা বোলে না মিথ্যা কোথা বললে পাপ হয়।

পুলিশ অফিসার এবার মংঘীরামের পায়ের গাঁটে এক ঘা রুলের বাড়ি বসিয়ে দিতেই 'ভ্যা ভ্যা' করে চেঁচাতে লাগলেন মংঘীরাম।

— আর এক ঘা দেবো?

—নেহি। ম্যায় সব কুছ বাতাতা হুঁ। ও নদীকা কিনার মে হামারা এক টিম্বারকা গোডাউন হ্যায়। ব্যস। আউর কুছ নেহি।

পুলিশ অফিসার বললেন—ওখানেও রেড হবে আজ। তারপর এস. পি. সাহেবের নির্দেশ মতো ব্যবস্থা হবে তোমার।

কনস্টেবলরা বলল—একে এখন কোথায় নিয়ে যাবো স্যার?

—কোথাও না। এইখানেই বেঁধে ফেলে রেখে দাও। আগে ওর বাড়ির ভেতরটা সার্চ করি, পরে ওর ব্যবস্থা হবে।

পুলিশ অফিসার এবার মংঘীরামের বাড়ির বউ ছেলে মেয়ে চাকর বাকর প্রত্যেককেই পৃথক পৃথকভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করে সকলকে এক ঘরে পুলিশ পাহারায় রেখে বাড়ি সার্চ করতে লাগলেন লোকজন নিয়ে।

দোতলায় একটি ঘরের ভেতর মেঝেময় ছড়ানো একশো টাকার নোটের বান্ডিলগুলো দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন। বললেন —এত টাকা। এগুলো জাল নোট নয় তো?

নোটগুলো বান্ডিল বেঁধে রেখে একতাড়া নোট স্যাম্পেল হিসেবে নিয়ে রঞ্জনের কাছে এলেন। বললেন—এবার বলো তো বাবা তুমি এখানে কি ভাবে এলে?

রঞ্জন তখন ট্রেন দুর্ঘটনার রাতের ঘটনা থেকে এক এক করে সব কিছু খুলে বলল পুলিশকে। তারপর বলল—আপনারা যে ভাবেই হোক রক্ষা করুন শবনমকে। ঐ শয়তান দস্যুটাকে মেরে শবনমকে

সুপথে ফিরিয়ে আনুন। নাহলে মেয়েটা একেবারে নষ্ট হয়ে যাবে। ওর দায়িত্ব আমি নেবো। ওকে আমাদের বাড়িতে নিয়ে যাবো।

—তোমার কি ধারণা মেয়েটি এখনো বেঁচে আছে ?

—ওর মধ্যে এক অলৌকিক শক্তি ভর করেছে। ওর কোন ক্ষতি কেউ করতে পারবে বলে মনে হয় না। তবুও বিশ্বাস তো নেই।

—তোমাকে ওরা এখানে নিয়ে এলো কি করে ?

—ঠিক বুঝতে পারলাম না। ঝোপড়ির ঘরে শুয়ে একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলাম হঠাৎ দেখি চারিদিকে আগুন আগুন চিৎকার। আর তারই সঙ্গে দেখতে পাই ঘোড়ায় চড়া কয়েকটা ডাকাত চারদিকময় ছুটোছুটি করছে।

—তারপর ?

—আমি তখন দিশেহারা হয়ে পড়েছিলাম কি যে করব কিছু ভেবে পাচ্ছিলাম না। ভাবলাম এই সময় বোকার মতো এখানে দাঁড়িয়ে থাকলে যদি ডাকাতদের নজরে পড়ে যাই তো ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলবে ওরা। তাই প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে পালাতে গেলাম। হিংলাজ সর্দারের একটা কুকুর ছিল। সেটা আমার পাশেই শুয়েছিল আমাকে পাহারা দেবে বলে। ঐ কুকুরটাকে নিয়েই পালাতে গেলাম। হঠাৎ অন্ধকারে দু'তিনজন লোক আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আমাকে তুলে নিয়ে চলে এলো।

—এই লোকগুলো মংঘীরামের ?

—হ্যাঁ। আসলে মংঘীরামের নির্দেশমতো লোকগুলো আমাদের দুজনের ওপর আক্রমণের জন্যই আসছিল। কেননা শবনমের জন্য ওর এতদিনের ঠগ্‌বাজির ব্যবসা নষ্ট হতে বসেছিল প্রায়। তাই ও চেয়েছিল আমাদের দুজনকে ওর কয়েদখানায় পুরে পয়েজন করে মেরে ফেলতে। কিন্তু আমরা যে সদা সর্তক ছিলাম তা বুঝতে পেরেই ওরা প্রকাশ্য বিদ্রোহে না এসে অপেক্ষা করছিল গভীর রাতের অন্যমনস্কতার। এমন সময় লালচাঁদের আবির্ভাব, শবনমের কেল্লা অভিযান এবং ঐ অকস্মাৎ অগ্নিকান্ড, তদুপরি আমার আত্মরক্ষার্থে

পলায়ন ওদের কাছে একটা লোভনীয় সুযোগ হয়ে দেখা দেয়।

— তোমাকে ওরা মারধোর করেনি ?

—না। শুধু বলেছিল শবনমকে নিয়ে আসার পর আমাদের দুজনকে জ্যান্ত পুঁতে ফেলবে।

পুলিশ অফিসার দাঁতে দাঁত চেপে ভয়ংকর রেগে বললেন তাই নাকি ?

—হ্যাঁ।

—ঠিক আছে। আজ তুমি আমার সঙ্গে আমার বাড়িতে চলো। ওখানে রাতটুকু খেয়ে ঘুমিয়ে আরামে কাটাতে পারবে। তারপর কাল সকালে আমি এস. পি সাহেবকে সঙ্গে নিয়েই ঐ কেল্লা পাহাড়ে অভিযান করব।

—কিন্তু তাতে যে অনেক দেরি হয়ে যাবে।

—এ ছাড়া তো উপায় নেই বাবা।

কেন উপায় নেই ?

—এই রাত দুপুরে ঘন অন্ধকারে কেল্লা পাহাড়ে উঠব কি করে ? পথ ঘাট চিনি না কিছু।

—আমি চিনিয়ে নিয়ে যাবো।

— তুমিও চিনতে পারবে না। এই অন্ধকারে এক হাত দূরের দৃশ্য দেখা যায় না।

বাঃ রে। আপনাদের তো টর্চ আছে !

—তা আছে। তবুও ঐ পাহাড়ে যেতে গেলে এই কটা লোক নিয়ে হবে না। আরো অন্তত দু'ব্যাটেলিয়ান লোক চাই। প্রয়োজন হলে ঐ কেল্লাটাকে আমরা উড়িয়ে ফেলব।

—কিন্তু ততক্ষণে শবনমকে কি উদ্ধার করা যাবে ?

—না। ওর ভেতরে সত্যিই যদি কোন অলৌকিক কিছু ভর করে থাকে তাহলে ওর কোন ক্ষতিই হবে না। যদি তা না হয়ে থাকে তাহলে কেল্লায় পৌঁছনোর সঙ্গে সঙ্গেই ও শেষ হয়ে গেছে। তাছাড়া আমাদের এখুনি একবার হেড কোয়ার্টারে খবর দিয়ে

মংঘীরামের গোডাউনটা রেড করা দরকার। এদিকে বিলম্ব করলে ওর লোকেরা তৎপর হয়ে মালপত্তর সব হাপিস করে দেবে। কিন্তু হিন্দোলকেল্লার গুপ্তধন নষ্ট হবে না বা ওর ভেতর বসবাসকারীরা নিজেরাও পালাতে অথবা মালপত্তর সরাতে পারবে না। তার কারণ ওখানে তোমার শবনম আছে। লালচাঁদ আছেন। তুমি অযথা ভয় পেয়ো না।

— ভয় পাচ্ছি তো আমি অন্য কারণে। ওরা ওই ভাবে হিন্দোল কেল্লা আক্রমণ করার পরই দস্যুরা এসে বস্তীতে আগুন ধরালো কি করে? তার মানে নিশ্চয়ই লালচাঁদ হার মেনেছেন। নিশ্চয়ই শবনমের ক্ষতি হয়েছে।

—তোমার এই সন্দেহটা অবশ্য অমূলক নয়। ঠিক আছে। তুমি চিন্তা কোর না। আমি এস. পি সাহেবের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করে তাঁর মতামতটা নিচ্ছি। ততক্ষণ তুমি আমার বাড়িতে গিয়ে বিশ্রাম করো। যাও। বলে একজন লোককে বললেন, কোথাও থেকে একটা গাড়ি ব্যবস্থা করে রঞ্জনকে ওনার বাসায় পৌঁছে দিতে।

লোকটি রঞ্জনের হাত ধরে বলল—এসো।

রঞ্জন বলল—আমার এখন কোথাও যেতে ভালো লাগছে না। আমি আপনাদের সঙ্গেই যাবো। কেননা আমার মনে যে দুশ্চিন্তা রয়েছে তাতে কিছুতেই শুয়ে ঘুমোতে পারব না আমি।

—তা হোক। তবু যাও।

অগত্যা যেতেই হ'ল। কিছু দূর যাবার পর একটি বাড়িতে এসে পুলিশের লোকটি দরজায় নক করতেই একজন লোক বেরিয়ে এলো —কি ব্যাপার! এত রাত্রে?

আপনার বাইকটা একবার দেবেন? ওই ছেলেটাকে বড়বাবুর বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসব।

—ঠিক আছে দাঁড়াও একটু। চাবিটা নিয়ে আসি। বলে লোকটি চাবি এনে দালানে রাখা বাইকটা বার করে বলল—

ছেলেটাকে পেলে কোথায় ?

—মংঘীরামের বাড়িতে।

—ও আবার ছেলে চুরির কারবারেও নেমেছে নাকি ?

—ছেলে মেয়ে সবই চুরি করছে। তবে আজ ওর বাড়ি রেড করে একেবারে সব কিছু তছনছ করে দিয়েছেন বড়বাবু। কয়েক বস্তা জাল নোট পর্যন্ত পাওয়া গেছে।

—বলো কি ? কিন্তু ধরলে কি হবে ? ধরে রাখতে পারবে ওকে ? ও তো ঠিক টাকার বাণ্ডিল দিয়ে বেরিয়ে আসবে।

—এবার আর ওটি হচ্ছে না। ওস্তাদের মার শেষ রাতে জানেন তো ? আগের এস. পি হঠাৎ বদলি।

যাই হোক। রঞ্জনকে বাইকের পিছন দিকে বসিয়ে লোকটি রাতের অন্ধকারে অনেক দূর গিয়ে একটি বাড়ির কাছে এসে হর্ন বাজাল। তারপর বাইক থেকে নেমে দরজায় কলিং বেল টিপতেই ভেতর থেকে সুরেলা গলায় সাড়া এলো।

কে ?

—আমি দুলাল। বড়বাবু একটি ছেলেকে পাঠিয়েছেন। ও আজকের রাতটা এখানে থাকবে।

সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে গেল। একজন সুন্দরী মহিলা দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন। তারপর রঞ্জনকে দেখে স্মিত হেসে বললেন এসো ভাই, ভেতরে এসো।

রঞ্জন ভেতরে ঢুকলে লোকটিও আবার চলে গেল বাইক নিয়ে।

পুলিশ অফিসারের স্ত্রী সেই সুন্দরী মহিলা বললেন – কি নাম তোমার ?

– আমার নাম রঞ্জন।

বাড়ি কোথায় ?

— কলকাতায়।

—এই রাতদুপুরে কোত্থেকে এলে ? কিছু খাওয়া দাওয়া হয়নি নিশ্চয়ই ?

—না। সারাদিন কিছু খাইনি। বড্ড খিদে পেয়েছে। যদি কিছু থাকে তো দিতে পারেন।

মহিলা মধুর হেসে বললেন—দুষ্টু ছেলে। যদি কিছু থাকে মানে? যাও। বাথরুমে গিয়ে হাত মুখ ধুয়ে এসো। আমি তোমার খাবার তৈরী করে দিচ্ছি।

রঞ্জন বাথরুমে গিয়ে মুখ হাত ধুয়ে আসতেই দেখল মায়ের মতো স্নেহময়ী সেই মহিলা ততক্ষণে আটা মেখে গ্যাসের উনুনে পরোটা ভাজার আয়োজন করছেন। রঞ্জন আসতেই বললেন—কই বলো দেখি তোমার কথা, গল্পও শুনি কাজও করি।

রঞ্জন তখন এক এক করে সব বলল।

সব শুনে মহিলা বললেন—ওমা! কি কেলেঙ্কারী কান্ড। জানি না বাবা পুলিশের ব্যাপার স্যাপার। কয়েকটা লোককে তোমার সঙ্গে দিয়ে আজ রাত্রেই তোমাকে ওখানে পাঠিয়ে দিতে পারত।

—উনিও ইচ্ছে করলে যেতে পারতেন।

—হয়তো অসুবিধে ছিল। তার কারণ ওই পাহাড় জঙ্গলে গাড়ি তো ঢুকবে না। তাছাড়া ডাকাতরা অতর্কিতে যদি আক্রমণ চালায় আর তাতে যদি কোন ক্ষয় ক্ষতি হয় বা প্রাণহানি ঘটে সে কৈফিয়ৎ দিতে হবে ওনাকেই। কেননা কেল্লা অভিযানের কাজে উনি যাননি। উনি গেছেন মংঘীরামজীর বাড়ি রেড করতে।

রঞ্জন বলল—এখন ধরুণ মংঘীরামের বাড়ীতে যে ডাকাতরা এসেছিল তাদেরই কারো পিছু নেবার দরকার হলে পুলিকে তো জঙ্গলে ঢুকতেই হোত।

—তা হোত বৈকি। তবে পুলিশের চাকরির মজাটা এই যে পুলিশকে দুঃসাহসও যেমনি দেখাতে হয় তেমনি ক্ষয় ক্ষতির দিকেও নজর রাখতে হয়। হিন্দোল কেল্লার ডাকাতদের সঙ্গে লড়াইতে আরো শক্তিশালি পুলিশবাহিনীর দরকার। তাছাড়া ওই ধরণের কাজের ঝুঁকি একা একা নিজের থেকেও নেওয়া যায় না। এস. পি সাহেবের অনুমতির দরকার। এস পি সাহেব যদি বলেন তাহলে

কিবা দিন কিবা রাত। যখন ইচ্ছে যাওয়া যেতে পারে। যাক। আর একটু সময় অপেক্ষা করো। এখনই তো রাত বারোটা। দেখতে দেখতে সকাল হয়ে যাবে।

রঞ্জনের ঘুম আসছে না। মনের মধ্যে দারুণ উত্তেজনা। তবু শুনতেই হ'ল। একে অন্ধকার রাত, তায় গভীর জঙ্গল। তাকে অতিক্রম করে পালিয়েও যেতে পারবে না ও। অবশ্য পালাবার সুযোগ পেলেও যাবে না। কেননা ঐ শ্বাপদ সংকুল অরণ্যে ঐ কাজ করতে গেলে হয় বাঘের পেটে যেতে হবে নয়তো ভালুকের আঁচড় খেয়ে বিকলাঙ্গ হয়ে পড়ে থাকতে হবে।

রঞ্জন তাই এই গভীর রাতের সুখ শয্যায় শুয়ে নিদারুণ উৎকণ্ঠায় প্রহর গুণতে লাগল। অবশ্য বেশিক্ষণ নয়। কিছু সময়ের মধ্যেই বড়বাবু ফিরে এলেন।

দরজায় কলিংবেল বাজতেই সেই মাতৃপ্রতীম মহিলা গিয়ে দরজা খুলে দিলেন।

রঞ্জনও উঠে গেল।

তরুণ পুলিশ অফিসার কয়েকজন কনস্টেবলকে নিয়ে ঘরে এসে এক গ্লাস জল খেয়ে বললেন—ভয় নেই রঞ্জনবাবু। তোমাকে অযথা আমি আটকে রাখব না। সকাল হলেই রওনা দেবো লোকজন নিয়ে। কেল্লাটাকে যাতে চারদিক দিয়ে ঘিরে ফেলা যায় সেই ব্যবস্থাই করতে যাচ্ছি।

—মংঘীরামের গোডাউনে কিছু পেলেন ?

—না। আমি যা ভয় করেছিলাম তাই হয়েছে। অর্থাৎ আমরা যাবার আগেই ওর লোকজনেরা আগুন ধরিয়ে দিয়েছে চারদিক থেকে। মংঘীরামকে বেদম পিটিয়েছি। ওর বাড়ির ভেতরেই আমাদের একটা ছোটখাটো ক্যাম্প বসে গেছে। কিছু অপহৃতা মহিলা, জাল নোটের বস্তা, সোনা দানা সব রাখা আছে। আমি এখুনি হেডকোয়ার্টারে চলে যাচ্ছি। আমার ফিরে আসতে সকাল আটটা হয়ে যাবে। একটু অপেক্ষা করো। আরো পুলিশ,

আরো গাড়ি অনেক কিছুরই প্রয়োজন। এস. পি সাহেব নিজেও হয়তো যেতে পারেন। তুমি শুধু আর মাত্র কয়েক ঘন্টা অপেক্ষা করো এখানে। কেমন? বলে যেমন এসেছিলেন তেমনি চলে গেলেন।

এরপরে আর কি ঘুম আসে?

ঘড়ির কাঁটায় টং করে রাত একটা বাজল। রঞ্জন বিছানায় শুয়ে আবার সেই নিঃসঙ্গ শয্যায় প্রহর গুণতে লাগল আর ভাবতে লাগল শবনমের কথা। শুধু যে শবনমের কথা তা নয়। এবার ওর বাড়ির কথা মনে হতে লাগল। মনে হচ্ছে যেন কতদিন বিদেশে আছে ও। মার মুখখানি মনে পড়ল। বাবার জন্য মন কেমন করল। ওর সঙ্গে তো ট্রাংক কলে কথা হয়েইছে। তাঁরা নিশ্চিন্তই আছেন। তাঁদের অত্যন্ত আদরের ছেলেটি যে এই অচেনা পরিবেশে ডাকাতপুরীতে পাহাড় জঙ্গলের দেশে কি জালে জড়িয়েছে তা তাঁরা কল্পনাও করতে পারবেন না।

ছয়

রক্তাক্ত শবনম রাতের অন্ধকারে ঘোড়ায় চেপে ছুটে চলেছে। রঞ্জনকে উদ্ধার না করেই শবনমের এইভাবে চলে যাবার ইচ্ছেটা ছিল না। কিন্তু ঘটনাটা এমনভাবে মোড় নিল যে না পালানো ছাড়া উপায়ও ছিল না তখন। কেননা ঠিক সেই মুহূর্তে পুলিশের হাতে ধরা পড়লে সব দিক কেঁচে যাবে। আগে তো প্রতিশোধ, তারপরে পুলিশ। বিশেষ করে একজনের ধরা পড়া মানেই দলকে দল ধরা পড়া। তাছাড়া শবনম আরো একটা দিক চিন্তা করে দেখল পুলিশ যখন এসেছে তখন এই শত্রুপুরীতে রঞ্জন যদিও থেকে থাকে তাহলে ওর নিরাপত্তার ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হওয়া যেতে পারে।

বিক্রমজিৎ ঘটনা স্থলেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে।

লালচাঁদ গুরুতর রকমের জখম হয়েছেন। ও নিজেও আহত হয়েছে বেশ ভালো রকম। তাই কোন রকমে মংঘীরামের প্রাসাদ থেকে পালিয়ে সুচিকিৎসার জন্য পাহাড়ের একটি খাদের কাছে আত্ম-গোপন করল। লালচাঁদও এখানেই যন্ত্রণায় ছটফট করছেন।

ওরা অতি নির্জন এবং নিরাপদ একটি স্থান দেখে সেখানে বসে ক্লান্তি দূর করতে লাগল। লালচাঁদের কয়েকজন লোক চলে গেল লোকালয়ের দিকে। যে ভাবেই হোক একজন ডাক্তারকে ডেকে এনে ওদের শরীর থেকে গুলি গুলো বার করাতে না পারলে ফল এমনই খারাপ হবে যে তখন আর কিছুতেই কিছু করা যাবে না।

একজন প্রবীন ডাক্তার এসে শবনমের ক্ষতস্থান দেখলেন। তারপর অভ্যস্থ হাতে শুরু করলেন কাজ। দুটি গুলির টুকরো বিঁধেছিল ভেতরে। সেগুলো বার করে ওষুধ দিয়ে ব্যান্ডেজ বেঁধে একটা ইনজেকশান দিলেন। তারপর লালচাঁদের বুক থেকে বুলেট বার করতে গিয়েই থমকে গেলেন।

শবনম বলল কি হ'ল ?

—এনার তো একেবারেই শেষ অবস্থা।

— তাহলে ?

—তাহলে আর কি ? দেখি চেষ্টা করে। তবে মনে হয় বাঁচাতে পারব না।

লালচাঁদ বললেন —আমাকে বাঁচতেই হবে ডাক্তার। যে ভাবেই হোক বাঁচান। এখনো আমার অনেক কাজ বাকি।

—কি করে বাঁচাব ? এ সব কাজ কি এইভাবে যেখানে সেখানে হয় ? নেহাত তোমাদের ডাকাতের প্রাণ তাই। অন্য কেউ হলে মরেই যেত এতক্ষণ।

—মরতে আমিও চাই ডাক্তার। শুধু আজ রাতটুকুর মতো তুমি আমাকে বাঁচিয়ে দাও।

—মরলে তুমি এখুনি মরবে। রাত কাটলে আর তোমাকে মারে কে ? দেখি চেষ্টা করে কতদূর কি করতে পারি।

ডাক্তারের কাজ শেষ হলে শবনম বলল —আমরা এই মুহূর্তে আপনার পারিশ্রমিক দিতে পারলাম না। তবে আপনার কার্ডটা রেখে যান। আমাদের লোক যথা সময়ে গিয়ে আপনার টাকা পেঁাছে দিয়ে আসবে।

ডাক্তারবাবু বললেন—টাকাই কি জীবনের সব মা ? এ সব কাজ পুলিশকে লুকিয়ে আমাদের প্রায়ই করতে হয়। তবে একটাই অনুরোধ, কখনো কোন বিপদে যদি পড়ি তখন তোমাদের সাহায্য চাইলে একটু পাশে এসে দাঁড়িও।

শবনম বলল—যদি বেঁচে থাকি আর ঐরকম দিন যদি সত্যিই কখনো আসে তাহলে নিশ্চয়ই আপনার পাশে গিয়ে দাঁড়াব আমরা।

ডাক্তারবাবু চলে গেলেন।

লালচাঁদকে বহু কষ্টে ঘোড়ায় বসিয়ে সবাই আবার সেই ঘনান্ধকারে কেল্লা পাহাড়ের ওপরে উঠতে লাগল।

সাধু ওদের জন্য হান টান করছিলেন এতক্ষণ।

বিক্রমের মৃত্যুর কথা এবং লালচাঁদের গুলিবিদ্ধ হওয়ার কথা

শুনে একদিকে যেমন দুঃখ পেলেন অপর দিকে তেমনি ক্রোধে ফেটে পড়লেন। এই ক্রোধ অবশ্যই ঐ শয়তান দুর্জন সিং এর ওপর। মংঘীরামের ওপর।

যাই হোক। লালচাঁদকে পাহাড়িদের জিম্মায় রেখে সাধু বললেন—আর দেরী নয়। এই হচ্ছে প্রকৃত শুভক্ষণ। এইবার আমরা গোপন পথে কেল্লার ভেতরে ঢুকব।

হিংলাজ সর্দার বলল—আমিও আপনাদের সঙ্গে যাব বাবা। ঐ শয়তানের শয়তানির উপযুক্ত জবাব আমিও দিতে চাই।

—বাইরে তাহলে নেতৃত্ব দেবে কে?

লালচাঁদ অতিকষ্টে বললেন বাইরেটা আমিই দেখতে পারব সর্দার। আপনি ভেতরে ঢুকুন। কেল্লা দখল হয়ে গেলেই আলোর সংকেত দেবেন। আমরাও তখন ভেতরে ঢুকব। কিন্তু যতক্ষণ তা না হয় ততক্ষণ যে ঐ কেল্লার ভেতর থেকে বেরোতে যাবে তাকেই গুলি করে মারব। অতএব সাবধান। সংকেত না দিয়ে কেউ যেন সামনের ফটক দিয়ে বেরোতে যাবেন না।

সাধু শবনমের একটি হাত ধরে টান দিলেন—আয় মা। দেবীর চরণ স্পর্শ করানো এই বন্দুক আর একবার দেবীর পদতলে রেখে চল ওই দুষ্টুকে দমন করতে।

সাধুবাবা শবনম, হিংলাজ এবং লালচাঁদের দলের আরো জনা চারেক যোদ্ধাকে সঙ্গে নিলেন। এদিকে পাহাড়ি বস্তীর সবাই প্রায় তীর, কাঁড়, টাঙি, বল্লম, কুড়ুল নিয়ে তৈরী। সবাই যেতে চায় সাধুর সঙ্গে ওই কেল্লার ভেতরে।

সাধু একটু কি যেন চিন্তা করলেন। তারপর বললেন—ঠিক আছে। সবাই আয়। তবে এই গোপন পথের সন্ধান কাউকে দিবি না। বিশেষ করে পুলিশকে। আজ রাতেই হোক আর কাল সকালেই হোক পুলিশ এখানে আসবেই। পুলিশ না যাওয়া পর্যন্ত আমি এই গুহার জঠরে লুকিয়ে থাকব। যদিও পুলিশ আমাকে চিনবে না। কেননা এখনকার নতুন নতুন পুলিশ আমার চেহারাটাই

দেখেনি কখনো। তাছাড়া আমি একজন তান্ত্রিক সাধু, এই হবে আমার পরিচয়। ভয় শুধু লালচাঁদকে নিয়ে।

লালচাঁদ বললেন—ভয় নেই। পুলিশ এলে আমিও গা ঢাকা দেবো। আমার লোকেরাও সরে পড়বে। তারপর পুলিশ চলে গেলে সাধারণ মানুষের মতো আমরা আবার এসে জুটে যাব ঠিক। তাছাড়া আপনার

গুলির পর গুলির আঘাতে·····পৃঃ—১৫২

আশীর্বাদে আর মা ভবানীর কৃপায় আমার দুর্বলতা একটু একটু করে কাটছে। মনে হচ্ছে এ যাত্রা হয়তো আমি বেঁচেও যেতে পারি।

মা ভবানী তোমার ভালো করুন। কেল্লাটা দখল করতে পারলে ওর ভেতরে পেট ভরে একটু খাওয়া দাওয়া করতে পারবে। আরামে ঘুমোতে পারবে। প্রয়োজন হলে শহরের হাসপাতাল থেকে কাল সকালে যে কোন ডাক্তারকে ডেকে এনেও তোমার আরো ভালো চিকিৎসা করাতে পারব। ওষুধ ইনজেকশান দেওয়াতে পারব।

—ঠিক আছে সর্দার। এখন মায়ের নাম নিয়ে ঢুকে পড়ুন। আর দেরি করবেন না। রাত বাড়ছে। দেরি হয়ে আসছে ক্রমশ।

সাধু হাত তুলে ইঙ্গিত দিলেন—জয় ভবানী।

সবাই বলল - জয় ভবানী।

—ভবানী কসম।

শবনম বলল আল্লা কসম।

সাধুর হাতে জ্বলন্ত মশাল।

সেই মশালের আলোয় পথ দেখে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল সকলে।

ভবানী মূর্তীর পিছন দিকের একটি ত্রিকোণাকৃতি অংশের কাছে গিয়ে সাধু কয়েকজনকে বললেন— এই খানে একটু শাবলের চাড় দে তো।

একজন খুব জোরে শাবলের চাড় দিতেই একটা আলকাতরা মাখানো কালো কাঠের দেয়াল সরে গেল। পাটাতনের ওপাশে কিছু ভারি পাথর থাকে থাকে সাজানো। এবার সবাই মিলে সেই পাথরগুলো এক এক করে নামাতেই একটি অপরিসর সুড়ঙ্গ মুখ নজরে এলো।

সাধু একজনের হাতে মশালটা দিয়ে সঙ্গে আনা রাইফেলটা উঁচিয়ে ধরলেন। তারপর পা টিপে টিপে এগিয়ে চললেন সামনের দিকে। এক জায়গায় গিয়ে হাতের ইঙ্গিতে সকলকে থামতে বললেন। তারপর নিঃশব্দে পাথরের দেয়ালে গা ঘেঁসে একটু একটু করে এগোতে লাগলেন। কিছুটা পথ যাবার পরই পৌঁছে গেলেন সঠিক জায়গায়। দুজন লোক যেখানে বসে দুর্গের বাইরের দিকে

নজরদারি করছিল এবং ধারে কাছে কেউ এলে তাকে গুলি করবার জন্য অপেক্ষা করছিল ঠিক সেইখানে।

এমন নিঃশব্দ পদ সঞ্চারণ যে, লোক দুটি টেরই পেল না কি চতুর পদক্ষেপে মর্মান্তিক মৃত্যু ধীরে ধীরে তাদের পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে।

সাধুর দু'চোখে এখন প্রতি হিংসার আগুন। এই গুহার জঠরে পা দেওয়া মাত্রই তাঁর পূর্ব স্মৃতি যেন আবার ফিরে এলো। সেই দস্যু সর্দারের মেজাজ আচ্ছন্ন করে ফেলল তাঁর দেহ মনকে। তিনি আবার সেই বিশ বছর আগের হিন্দোল সর্দার হয়ে উঠলেন। বন্দুকটা উঁচিয়ে ধরে একবার শুধু বলে উঠলেন—জয় ভবানী।

ডাকাত দুটি নিদারুণ ভয়ে চমকে উঠে ফিরে তাকাতেই সুনিপুণ ভাবে ট্রিগার টিপলেন—ডিস্যুম, ডিস্যুম।

দু-দুটো প্রাণ লুটিয়ে পড়ে কবুতরের মতন ছটফট করতে লাগল।

ওদের বুকের রক্তে তিলক কেটে ইঙ্গিতে সবাইকে চলে আসতে বললেন। বিনা যুদ্ধে আসল জায়গাটাই কব্জা হয়ে গেছে। কেল্লা এখন হাতের মুঠোয়। সাধুর ডাক শুনে হৈ-হৈ করে ছুটে এলো সবাই।

একজনের হাত থেকে মশালটা টেনে নিয়েই একেবারে বুরুজের মাথায় উঠে গেলেন সাধু। তারপর ঘন ঘন মশাল আন্দোলন করে চেঁচাতে লাগলেন—এসো, এসো, সবাই চলে এসো ভেতরে। এবার শুধু দেখো আর মারো।

সাধুর ইঙ্গিত পেয়েই লালচাঁদ তার দল বল নিয়ে কেল্লার মুখে ছুটে এলেন। বিশাল তোরণ ভেতর থেকে বন্ধ ছিল। তাই ঘন ঘন দরজায় লাথি আর ধাক্কা দিতে লাগল।

সাধু ওপর থেকে নেমে এসে ফটকের দরজাটা খুলে দিতে বললেন সকলকে।

হিংলাজ সর্দার নিজে গেলেন দরজা খুলতে। কিন্তু দরজার মুখেই বাধা। যমের মতন দুজন লোক ঝাঁপিয়ে পড়ল হিংলাজের ওপর।

সাধু চেঁচিয়ে উঠলেন—খবরদার। যানে দো উসকো।

লোক দুটি সাধুর কণ্ঠস্বরে চমকে উঠল। একজন বলল—আপ—কৌন হ্যায় ?

—তোদের বাবা। এই কণ্ঠস্বর তোরা অনেকদিন শুনতে পাসনি নারে ?

—স—স—সর্দার ! আপ জিন্দা হ্যায় ?

—হ্যাঁ। আমি জিন্দা আছি। কিন্তু তোমরা এবার মরবার জন্য তৈরী হও।

শবনম বন্দুক উঁচিয়েছিল।

সাধু বললেন—না। ওভাবে নয়। টাঙ্গি দিয়ে কুপিয়ে কুপিয়ে কেটে ফেলো ওদের। কেউ গিয়ে দরজাটা খুলে দাও। লালচাঁদ ভেতরে ঢুকুক। ওর লোকজন বাইরে অপেক্ষা করছে।

নির্দেশ পাওয়া মাত্রই হিংলাজের লোকেরা ঝাঁপিয়ে পড়ল সেই লোক দুটির ওপর। টাঙ্গির কোপে কচুকাটা করে ফেলল আক্রমণ কারীদের। ফটকের দরজায় খিল খুলে দিতেই লালচাঁদ তাঁর দলবল নিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়লেন। তারপর হৈ হৈ করে ছুটে চললেন সামনের দিকে।

লালচাঁদের এ সবই তো পরিচিত। হিন্দোল সর্দারের সব চেয়ে প্রিয় পাত্র ছিলেন তিনি। কিন্তু ভবিতব্য এবং দুর্জনের বিশ্বাস ঘাতকতায় দীর্ঘ কুড়িটা বছর এই কেল্লার মসনদ থেকে দূরে থাকতে হয়েছিল। লালচাঁদ দুর্বার গতিতে এগিয়ে চললেন। তিনি যে আহত। তাঁর এখন বিশ্রামের প্রয়োজন তা তিনি মনেই করলেন না।

ওরা দলবল সমেত যেই কেল্লার মাঝামাঝি জায়গায় গিয়ে পেঁছেচে অমনি দেখল চারদিক থেকে দুর্জন সিংয়ের লোকেরা ঘিরে ফেলল ওদের।

লালচাঁদের লোকেরাও তো নিরস্ত্র নয়। তাই বন্দুক উঁচিয়ে রুখে দাঁড়াল।

শত্রুপক্ষের হাতে হাতে মেসিনগান। তারা এমনই মরিয়া যে লালচাঁদের লোকেদের আক্রমন করবার কোন রকম সুযোগ না দিয়েই শুরু করে দিল—ট্রা-রা-রা-রা-রা।

লালচাঁদ মাঝামাঝি জায়গায় ছিলেন। তাই কোন রকমে বসে পড়ে প্রাণ বাঁচালেন। কিন্তু তাঁর দলের লোকেদের দু'তিন জন একেবারে চিরনিদ্রায় শুয়ে পড়ল।

শত্রুপক্ষের লোকও মরল বৈকি।

একজন ছাড়া প্রায় সবাই শেষ।

যে একজন বেঁচে ছিল, শবনমের গুলিতে সেও লুটিয়ে পড়ল।

কিন্তু আসল মাল কোথায়? সেই দুর্জন সিং?

সাধু চিৎকার করে উঠলেন—কোথায় গেল সেই শয়তান কুত্তাটা। বেরিয়ে আয় আমার সামনে। বেরো বলছি।

কারো কোন সাড়া শব্দ কোথাও নেই।

সাধু বললেন—শোনো তোমরা! এই কেল্লার ভেতরে যেদিকে এতটুকু ফাঁক পাবে সে দিকেই ঢুকে পড়ো সবাই। চারিদিকে তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখো কে কোথায় আছে। বুরুজের মাথায় উঠে যাও কয়েকজন। এখনো নিশ্চিন্ত হবার কোন কারণ নেই। ঐ শয়তান দুর্জন সিং আড়াল থেকে লুকিয়েও আক্রমণ করতে পারে।

এমন সময় হিংলাজ সর্দার ছুটে এসে বলল—সাধুজী! একটা জেলখানার মতো ঘরে পঁচিশ জন যুবতী মেয়েকে আটকে রেখেছে ওরা। আমার মেয়েটাকেও বোধ হয় ঐ খানেই রেখেছিল।

—বার করে আনো।

—কিন্তু লোহার গরাদে তালা দেওয়া।

—ভাঙতে পারলে না? ভাঙো।

—আমার লোকেরা তালা ভাঙার কাজে লেগে গেছে বাবা।

আর একজন ছুটে এসে বলল—আমরা এইমাত্র দুটো ছেলেকে মুক্ত করে আনলাম।

—ওদের তোমাদের জিম্মায় রাখো। আর তন্ন তন্ন করে খুঁজে

দেখো দুর্জন সিং লুকলো কোথায় ? ওকে খুঁজে বার করতেই হবে।

যে ঘরে বন্দিনী মেয়েদের আটকে রেখেছিল দুর্জন সিং'এর লোকেরা শবনম সেই ঘরের দিকে গেল।

মেয়েরা ভেতর থেকে চিৎকার করছে—আমাদের মুক্তি দিন। আমাদের বাঁচান। কেউ বলছে—আমাকে আমার মা বাবার কাছে পেঁাছে দিন। কেউ বলছে—আমার দুধের শিশুটাকে কতদিন দেখি নি গো। আমাকে তোমরা ছেড়ে দাও। কেউ বা ডুকরে কেঁদে উঠে বলল—ওরা আমার স্বামীকে খুন করেছে। আমার সর্বনাশ করেছে। আমি কোন মুখে বাড়ি ফিরব ?

শবনম বলল—আমার মা ভগিনীরা। আপনাদের আর কোন ভয় নেই। এই কেল্লা আমরা দখল করেছি। এখন আপনারা মুক্ত। আমরা আপনাদের প্রত্যেককে যার যার ঠিকানায় পেঁাছে দেবো। যার একেবারেই ফিরে যাবার কোন উপায় নেই তাকে আমাদের কাছে রেখে দেবো।

বেশ কিছুক্ষনের চেষ্টায় তালা ভাঙা হতেই মেয়েরা বেরিয়ে পড়ল।

এমন সময় হঠাৎ এক পৈশাচিক উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল হিংলাজ সর্দার—পেয়েছি পেয়েছি। শয়তানের বাচ্চাটাকে পেয়েছি।

সাধুবাবা ছুটে এলেন—কাকে পেয়েছ হিংলাজ ?

—এই দেখুন !

—বিশ্বাসঘাতক কোথায় লুকিয়েছিল এতক্ষণ ?

হিংলাজ বলল—এই চৌবাচ্চাটার ভেতর। আমি চারিদিক দেখতে দেখতে হঠাৎ দেখি চৌবাচ্চার মাথায় একটা কাঠের তক্তা ঢাকা দেওয়া আছে। দেখেই সন্দেহ হ'ল। যেই না ঢাকাটা সরিয়েছি অমনি শয়তানটা বন্দুক উঠিয়েছে। মারলুম মুখে এক ঘুসি।

—আর মেরো না। ওকে আমার হাতে ছেড়ে দাও।

—না। ওর জন্যে আমার মেয়েটা আত্মঘাতি হয়েছে। ওকে আমি ছাড়ব না। আমি নিজে হাতে ওর গলার টুঁটি ছিঁড়ব।

—ও কাজটা আমাকে করতে দাও হিংলাজ। আমি ওর

পেটটাকে ফালা করে চিরে দেবো শুধু।

দুর্জন সিং ভয়ে থর থর করে কাঁপছে। আর তার পালাবার পথ নেই। চারিদিক থেকে সবাই ছেঁকে ধরেছে ওকে।

সাধু বজ্র নির্ঘোষে বললেন—মাথার ওপর হাত ওঠাও দুর্জন। অদ্যই তোমার শেষ রজনী। কিছুক্ষণ সময় দিচ্ছি শুধু নিজের প্রিয় মুখগুলিকে একবার চিন্তা করে নাও। তারপর তোমাকে আমি একটু একটু করে মৃত্যুর দরজায় ঠেলে দেবো। তার আগে একবার ভালো করে তাকিয়ে দেখো আমায় তুমি চিনতে পারো কিনা?

দুর্জন একবার তাকিয়ে দেখেই বলল—সর্দার তুম!

—হ্যাঁ আমি।

—তুম আভি তক জিন্দা হ্যায়?

—না। আমি মরে গেছি। এটা আমার প্রেতাত্মা। তোমার সঙ্গে জীবনের শেষ দেখা করতে এসেছি আমি ছোরা, টাঙ্গি আর বন্দুকের গুলি নিয়ে। বলো এর মধ্যে কোনটা তোমার পছন্দ?

দুর্জন কাঁপতে কাঁপতে বলল—এর কোনটাই আমার পছন্দ নয়। তুমি আমাকে আর একবার—জীবনের শেষবার, তোমার সঙ্গে দোস্তি করবার সুযোগ দাও সর্দার।

লালচাঁদও তখন দুর্জনের সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। বললেন—তোমার সঙ্গে দোস্তি করলে আমি আমার বউ ছেলেকে ফিরে পাবো?

দুর্জন শিউরে উঠল লালচাঁদকে দেখে।

লালচাঁদ দুটো পেরেক দুহাতে নিয়ে এগিয়ে আসতে লাগলেন ওর দুটো হিংস্র চোখ দুটোর দিকে।

দুর্জন চিৎকার করে উঠল—নেহি। নেহি। নেহি।

—বল শয়তান, কিসের লোভে আমার ছেলেটাকে গুলি করে মারলি? কেন আমাদের অমন সর্বনাশ করলি? আমার বউকে কেন তুলে নিয়ে গেলি তুই? কেন তুই সর্দারের সঙ্গেও বিশ্বাস-ঘাতকতা করলি? বল, বল, কেন করতে গেলি ঐ চরম বেইমানি?

—ম্যায় তুমহারা গোড় পাকড়তি হুঁ। মুঝে ক্ষমা করো

লালচাঁদ। এ সাজা মুঝে মাৎ দো।

সাধু তখন সাধু নয়। আবার সেই হিন্দোল সর্দার। বহুদিনের অভ্যস্ত পায়ে এক লাথি মারলেন দুর্জনকে। সে লাথি হজম করার শক্তি দুর্জন সিং এর নেই। তাই দশ হাত দূরে ছিটকে পড়ল।

ততক্ষণে হিংলাজ সর্দার আবার ঝাঁপিয়ে পড়েছে দুর্জনের ওপর।

ওদিক থেকে শবনমও ছুটে এসেছে তখন—ওকে ছেড়ে দাও—ওকে ছেড়ে দাও সর্দার। আমি যে ভীষণ প্রতিজ্ঞা নিয়েছি ওকে কুকুরের মতো গুলি করে মারবার।

সাধু সাবধান করলেন। লালচাঁদও বাধা দিলেন।

সেই সুযোগে শয়তান আবার নিজ মূর্তি ধরল। হঠাৎ লাফিয়ে উঠেই এলোপাথাড়ি গুলি করতে লাগল চারিদিকে। দু'চারজন পাহাড়িয়া গুলি খেয়ে ছটফট করতে লাগল। তারপরই সব শেষ! গুলিও শেষ। আর যেই না শেষ হওয়া অমনি প্রাণ ভয়ে ফটকের দিকে দৌড়ল দুর্জন।

শবনম ওকে ভয়ংকরভাবে তাড়া করে চলল—পালাবি কোথায় শয়তান? আজ আমার হাতেই তোর মরণ। জয় মা ভবানী।

দুর্জন তখন কেল্লার বাইরে। শবনমও বেরিয়ে এসেছে। কেল্লার ভেতরে থাকায় বুঝতেই পারেনি কেউ, কখন যে এক সময় ভোরের আলো ফুটে উঠেছে।

শবনমকে একা পেয়ে রুখে দাঁড়াল দুর্জন।

আর হিংস্রী শবনম তখন সেই অভিশপ্ত বন্দুকের গুলিতে ঝাঁজরা করে দিল দুর্জনের দেহটা। গুলির পর গুলির আঘাত দুর্জনের দেহটা ছিটকে পড়ল পাথরের বুকে। একবার শুধু থর থর করে কেঁপে উঠল দেহটা। তারপর একেবারে স্থির হয়ে গেল।

ক্লান্ত শবনম তখন সেইখানেই বসে পড়েছে। আঃ কি দারুণ শান্তি। ভোরের বারতা নিয়ে প্রকৃতি ধীরে ধীরে ফুটে উঠছে তার আপন বৈচিত্রে।

সাধু এসে শবনমের মাথায় হাত রাখলেন।

শবনম ডাকল—বাবা !

—মা !

—আপনি এবার আত্মগোপন করুন।

—কেন রে পাগলি ? আমি চোর না ডাকাত ? এখন আমি

ছুটে এসে মারল এক লাফ···পৃঃ ১৫৪

মা ভবানীর উপাসক। আমার অতীতও নেই। ভবিষ্যৎও নেই।

আছে শুধু বর্তমান। আমার আসল পরিচয়টা কাউকে দিস না। তাহলেই হবে।

সাধু ও শবনমের কাছে লালচাঁদও এসে দাঁড়ালেন।

সাধু বললেন—ওদিককার কাজ কতদূর ?

—হিংলাজের লোকেরা ধোয়া মোছার কাজে লেগে গেছে। ডেডবডি গুলোকেও বুরুজের মাথা থেকে ফেলে দিচ্ছে নীচের খাদে।

—বারুদ বন্দুক বা অন্যান্য মারাত্মক অস্ত্র শস্ত্র যা কিছু আছে কেল্লার বাইরে দূরে কোথাও নিয়ে গিয়ে সব লুকিয়ে ফেলো।

লালচাঁদ চলে গেলেন।

এমন সময় বহু দূর থেকে সেই পরিচিত কণ্ঠস্বরটি আবার শোনা গেল শ—ব—ন—ম !

—কে ! কে ডাকে ! রঞ্জন ! রঞ্জন তুমি কোথায় ?

—এই তো আমি এখানে।

—কি আশ্চর্য ! তুমি ওখানে গেলে কি করে ?

—আমি পথ ভুল করেছি শবনম। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তোমার কাছে চলে এসেছি। আমার সামনে গভীর খাদ।

—তুমি ঐখানেই থাকো। যেন লাফিয়ে আসতে যেও না। পড়ে যাবে। আমি হিংলাজ সর্দারকে পাঠাচ্ছি। তোমাকে পথ চিনিয়ে নিয়ে আসবে। একটু অপেক্ষা করো তুমি।

রঞ্জন বলল—মায়ের নাম নিয়ে একটা লাফ দেবো ?

শবনম তখন খাদের কাছাকাছি চলে গেছে। বলল—খবরদার ঐ কাজ করতে যেও না। অযথা জীবনের ঝুঁকি কেন নেবে ?

কিন্তু দুরন্ত দুর্বার দামাল কিশোর কি পিছিয়ে থাকতে পারে ? হঠাৎ একটু পিছিয়ে গিয়ে ছুটে এসে মারল এক লাফ।

শবনম কাছে গিয়ে জড়িয়ে ধরল রঞ্জনকে। ওর গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে বলল—তুমি ভালো আছো তো ?

—আমি ভালো আছি। তোমার কাঁধে ব্যাণ্ডেজ কেন ?

—ও কিছু নয়। একটা গুলি লেগেছিল। কিন্তু এই বিপজ্জনক

পথে একা তুমি কিভাবে এলে ?

— সে অনেক কথা। পরে বলব খন। এক পুলিশ অফিসারের ঘরে রাত্রিতে ছিলাম ! শেষ রাতে তোমার কথা ভেবে ভেবে আর থাকতে পারলাম না ! কাউকে কিছু না জানিয়েই পালিয়ে এসেছি।

—এটা তুমি খুবই অন্যায় করেছ রঞ্জন। কী ভাববেন বলতো তাঁরা। তাছাড়া এই বন্দুক তুমি পেলে কোথায় ?

—পথে আসতে আসতে কুড়িয়ে পেয়েছি।

—বন্দুক কি করে চালাতে হয় তাই জানো না অথচ বন্দুক ঘাড়ে নিয়েছ দুষ্টু কোথাকার।

রঞ্জনকে দেখে সাধুবাবাও এগিয়ে এলেন।

শবনম বলল — বাবা এই সেই। আমার রঞ্জন।

— বাঃ ভারী চমৎকার দেখতে তো তোমার এই ক্ষুদে বন্ধুটিকে। তোমরা যে দেখছি একেবারে মানিক জোড় হয়ে গেছ ?

—ওকে যে আবার ফিরে পাবো তা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি বাবা।

রঞ্জন বলল আমাদের কেল্লা অভিযান হয়ে গেছে ?

—হ্যাঁ। যার নামে এই কেল্লা ইনিই সেই। হিন্দোল সর্দার।

—সে কি ! ইনি তো একজন সাধুবাবা।

—এঁর পরিচয় পরে দেবো তোমাকে। পুলিশের ঝামেলাটা আগে চুকে যাক। তবে একটু জেনে রেখো আসল শয়তানকে আমি নিজে হাতে গুলি করে মেরেছি।

এমন সময় হিংলাজ সর্দার এসে রঞ্জনকে দেখেই উল্লসিত হয়ে উঠল—এই তো খোকাবাবু এসে গেছেন দেখছি। আসুন ভেতরে আসুন। মুখ হাত ধুয়ে গরম গরম হালুয়া পুরী খেয়ে শরীরটাকে একটু চাঙ্গা করে নিন।

সাধু বললেন—ঠিক বলেছ। এইবার শরীরটাকে একটু চাঙ্গা করার দরকার। চলো ভেতরে চলো।

ওরা যখন কেল্লার ভেতরে ঢুকল তখন পুবের পাহাড়গুলোর চূড়া ডিঙিয়ে সোনার বরণ তরুণ তপন রাঙা মুখে উদয় হচ্ছে।

ভবানী মন্দিরে আজ জোর পূজার আয়োজন। আজকের এই পরিবেশ দেখলে কেউ ধারণাই করতে পারবে না যে এখানে একটা ডাকাতের ঘাঁটি ছিল বা এরাও মোস্ট ডেঞ্জারাস বলে। চারিদিকে শুধুই পূজো পূজো গন্ধ। বন্দিনী মেয়েরা সবাই অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে শবনমের সাথে এক যোগে কাজে লেগেছে। সাধু একজন লোককে নীচে পাঠিয়ে কিছু নতুন বস্ত্র কিনে আনিয়েছেন। শবনমও ওর ডাকাত রাণীর পোষাক ত্যাগ করেছে। সাবান মেখে ঝর্ণার জলে স্নান করে রঙিন একটি ডুরে শাড়ি পরে একটা প্রজাপতির মতো যেন উড়ে বেড়াচ্ছে। ওর চেয়ে সুখি বোধ হয় আর কেউ নেই।

রঞ্জনও শবনমের পরিবর্তনে অভিভূত। এই না হলে মেয়ে। কি ভালো যে লাগছে শবনমকে। এমন সুন্দর মেয়েটি কোথাও কিছু নেই হঠাৎ ফুলনদেবী হয়ে বসে রইল। এর চোখে গভীর প্রশান্তির কোলে ঐ হত্যার ঝিলিক একেবারেই অসহ্য।

আজ শুধু দেবীর গলায় নয়। সবার গলাতেই ফুলের মালা। রক্ত চন্দনের টিপ। ভবানী মন্দিরের গুহার জঠরে শুধু ধূপ ধুনোর গন্ধ। কাটা ফলের সুবাস। হিন্দোল কেল্লার চূড়ায় আজ পত পত করে উড়ছে হলুদে ছোবানো পতাকা।

কেল্লার ভেতর থেকে বড় বড় হাঁড়ি কড়া ইত্যাদি এনে বাইরে ভিয়েন বসানো হয়েছে। বড় বড় কড়াইতে খিচুড়ি রান্না হচ্ছে।

এরই মধ্যে সাধুর নির্দেশে কেল্লার ভেতরে গুপ্ত কক্ষগুলিতে যাবার পথগুলো পাথর সাজিয়ে রুদ্ধ করে দিয়েছে সকলে। হিংলাজ সর্দারের লোকেরা লালচাঁদের লোকেদের নিয়ে দলবদ্ধ হয়ে এই কাজ করেছে। লালচাঁদের লোক অবশ্য দু'চার জন। ওদের লোকই বেশি। এমনভাবে পথ রোধ করেছে যাতে অচেনা কেউ এর ভেতরে ঢুকলে ওদিকে যে যাবার রাস্তা আছে তা বুঝতে না পারে।

বেলা প্রায় বারোটা নাগাদ পুলিশ এলো।

তরুণ পুলিশ অফিসার এসেই রঞ্জনকে বকাবকি করলেন—কি হে ছোকরা! তুমি যে ঐ ভাবে পালিয়ে এলে তোমার সাহস তো কম

নয় ? আর একটু তর সইল না তোমার ? এই জঙ্গলের পথে একা একা চলে এলে ভয় করল না ? আমি তো ভাবলাম নিয়তি তোমাকে ডেকেছে। নির্ঘাত তুমি বাঘের পেটে গেছ।

রঞ্জন বলল—আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। আমি কিছুতেই থাকতে পারছিলাম না। জানি খুবই অন্যায় করেছি। তা আমাদের এস. পি. সাহেব কোথায় ? তাঁকে দেখছি না কেন ?

—উনি হঠাৎ একটা অন্য কাজে আটকে পড়েছেন। তবে ওনার ইচ্ছে যে আমি তোমাদের দুজনকে নিয়ে একবার ওনার বাসাতে যাই। বলে তাঁর লোকেদের বললেন—এই হাঁ করে সব দাঁড়িয়ে আছিস কেন ? কেল্লাটাকে ঘিরে ফেল।

এই কথা শুনে এক ডিস পূজার প্রসাদ নিয়ে হাসতে হাসতে এগিয়ে এসে শবনম বলল—তার আর প্রয়োজন হবে না। এখন এগুলো খেয়ে নিন দেখি।

তরুণ অফিসার মুগ্ধ হয়ে গেলেন শবনমকে দেখে। বললেন—তুমি কে মা ? নিশ্চয়ই আমাদের নতুন ডাকাত রাণী শবনম দেবী ?

সাধু নিজে এবার এগিয়ে এসে বললেন—না। শুধু দেবী।

তরুণ অফিসার এগিয়ে এসে সাধুকে দেখে ভক্তিভরে প্রণাম করে বললেন—আপনি কে বাবা ?

—আমি এক ভবঘুরে সন্ন্যাসী। ঘুরতে ঘুরতে এখানে এসে দেখি হঠাৎ এক কান্ড। তা এই সব পাহাড়ী লোকজনদের সঙ্গে নিয়ে বহু কষ্টে মেরে ধরে তাড়িয়েছি দুর্বৃত্তগুলোকে। কেল্লা এখন শত্রুমুক্ত। এই সব আদিবাসীরা আশ্রয়হীন হয়ে বড় কষ্ট পাচ্ছিল। আমি ওদের সবাইকে ঢুকিয়ে দিয়েছি ঐ কেল্লার ভেতর। এখানে এক জায়গায় মা ভবানীর একটি মূর্তিও রয়েছে দেখছি। তাঁরই আরাধনা করছিলাম এতক্ষণ।

—আপনার নেতৃত্বই এদের প্রেরণা যুগিয়েছে বাবা। আপনি তাহলে এক কাজ করুন না, এখানেই থেকে যান না বরাবরের জন্য।

—এরাও তাই বলছে। আমিও ভাবছি। আমরা দলবদ্ধ হয়ে

এখানে বসবাস করলে এই কেল্লা চিরকাল শত্রুমুক্ত থাকবে।

শুধু তাই নয়, এই সব লোকজনগুলোও মানুষ হয়ে যাবে। আপনি থেকে যান। আমিও এই বিদেশে একঘেয়ে দিন কাটাচ্ছি। মাঝে মধ্যে আপনার বউমাকে নিয়ে এখানে বেড়িয়েও যাবো। চাই কি কেল্লার ভেতরে থেকেও যাবো দু'একটা দিন।

সাধু বললেন—ভালোই হবে।

যাক। পুলিশের দায়িত্ব আপনারাই অনেকটা পালন করে দিয়েছেন। আপনাদের কখনো কোনো অসুবিধা হলে আমাকে জানাবেন। আমি সব রকমের সাহায্য করব। হ্যাঁ, একটা কথা। ওদের ঘাঁটি থেকে কোন মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র কিছু পান নি?

সাধু জানতেন পুলিশ একথা জানতে চাইবে। তাই কিছু অস্ত্র পুলিশকে দেবার জন্য হাতের কাছেই রেখেছিলেন।

পুলিশের লোকেরা সেগুলো গ্রহণ করল।

সাধু বললেন অনেক অসহায় মেয়ে এখানে বন্দী জীবন কাটাচ্ছিল। তাদের যার যার বাড়িতে ফিরিয়ে দেবার ব্যবস্থাটা একটু তাড়াতাড়ি করে দিতে হবে কিন্তু।

মেয়েরা সবাই বলল—না। আজ আমরা কোথাও যাব না। যা হবে কাল। আজ আমরা এখানে মাতৃ আরাধনা করব।

সাধু বললেন শবনম তুমি কি করবে? রঞ্জন?

রঞ্জন বলল—এখন এখান থেকে চলে যাওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না। আরো দু'একটা দিন থাকতেই হবে এখানে।

শবনম বলল—হ্যাঁ বাবা। ওকে যেতেই হবে। নাহলে ওর মা বাবা চিন্তা করবে খুব। আমি কিন্তু আপনাকে ছেড়ে যাবো না। এই কেল্লা ঐ পাহাড় এই অরণ্য এর চেয়ে মধুময় আমার কাছে আর কিছুই নেই। তাছাড়া আমি চলে গেলে মা ভবানীর সেবা পুজার জোগাড় করে দেবে কে?

রঞ্জন বলল কি পাগলের মতো বকছ যা তা! তোমার সামনে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। লেখাপড়া করবে। বড় হবে। যেতেই হবে

তোমাকে। আমি তোমাকে নিয়ে যাব।

সাধু বললেন—ও ঠিকই বলেছে মা। এই বনবাস তোমার সাজে না। তাছাড়া এখন তো আর তোমার জাত পাত নেই। তুমি এখন দেবী। তুমি আমার মেয়ে। মা ভবানীর মেয়ে।

—তবু আমি এখানেই থাকব। এই ভবানী মন্দিরে দেবদাসী হয়ে বেঁচে থাকব সারা জীবন। আপনাকে ছেড়ে আমি কোথাও যাব না। রঞ্জনকে যেতেই হবে। ও যাক। বরং আমাদের বন্ধুত্বকে স্মরণীয় করে রাখতে মাঝে মধ্যে ও চলে আসবে এখানে। পারলে ওর মা বাবাকেও নিয়ে আসবে।

রঞ্জনের চোখে যেন জল এসে গেল। বলল তুমি যাবে না শবনম?

শবনম স্মিত হেসে ঘাড় নাড়ল—না।

পুলিশ অফিসার বিদায় নিলেন। পাহাড়িয়া মানুষগুলো আবার নতুন করে কাজে মেতে উঠল। শবনম রঞ্জনের হাত ধরে টানতে টানতে কেল্লার বুরুজের মাথায় উঠে গেল। অভিমানে রঞ্জনের বুক তখন ভরে উঠেছে।

শবনম বলল—তোমার ভালোর জন্যই আমি যাচ্ছি না। তুমি বড় হও। নিজের পায়ে দাঁড়াও। তারপরও যদি আমার কথা মনে থাকে তাহলে আমাকে এসে নিয়ে যেও, আমি যাবো। এই মুহূর্তে যদি তোমার মা বাবা অরাজি হন আমি তাহলে যাব কোথায়? ঐ পার্লস্ট্রীটের ফ্ল্যাটে আমি আর ফিরছি না। তুমি আমাকে ভুল বুঝো না রঞ্জন। এখানে আমি সুখেই থাকব।

রঞ্জন বুরুজের খাঁজে মাথা রেখে কাঁদছিল।

শবনম আলতো করে পিঠে হাত রেখে ডাকল—রাজা।

—উঁ।

—আজ আমাদের গৌরবের দিন। আনন্দের দিন। আজ আমাদের বিজয় উৎসব। আজকের দিনে কেউ চোখের জল ফেলে? আজ তুমি রাজা। আমি তোমার রাণী। আমাকে রাণী বলে ডাকো।

রাণী।

এই তো দুষ্টু ছেলেটার কথা ফুটেছে। এবার আমার দিকে তাকিয়ে একবার হাসো।

জলভরা চোখে রঞ্জন তাকাল শবনমের দিকে। শবনম ওর আঁচলের খুট দিয়ে রঞ্জনের চোখের জল মুছিয়ে দিল।

রঞ্জন বলল—আমি ফিরে গেলে তুমি আমাকে ভুলে যাবে না তো রাণী?

—আল্লা কসম। মা ভবানীর দিব্যি। আমার এই বন্ধু রাজাকে আমি কি ভুলতে পারি? তুমি ফিরে যাও। মাঝে মাঝে তোমার মা বাবাকে নিয়ে এখানে বেড়াতে এসো। আমি তোমার স্মৃতি বুকে নিয়ে এখানে সুখে থাকি। রাজ্য পাট চালাই। তারপর যখন আমরা আরো বড় হব তখন যা হয় হবে।

হিন্দোল কেল্লার বুরুজের মাথায় ওরা দুজনে হাতে হাত রেখে গঙ্গা যমুনার ধারার মতো এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে বইতে লাগল। চারিদিকের পাহাড় ও বনভূমিতে উজ্জ্বল দিন এবং আকাশের নীলিমায় সাদা মেঘের নিরুদ্দেশ যাত্রা উদাস করে দিল মনকে। নীচে ভবানী মন্দিরে ভোগারতির ঘণ্টা বাজল বুঝি। এই দুই কিশোর কিশোরী এই চির সবুজের দেশে সকলের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেন এক নতুন পৃথিবী সৃষ্টি করে নিল। এক ঝাঁক রঙিন টিয়া রঙের বাহার নিয়ে হারিয়ে গেল সুদূর বনরেখায়। এই বন, এই পাহাড়, এই রঙিন স্বপ্ন সবই যেন কাব্যময় হয়ে উঠল।

সমাপ্ত